কবিতার কথা

জীবনানন্দ দাশ

জীবনানন্দ দাশ

সিগনেট প্রেস কলকাতা ২৩

রচনাকাল
১৩৪৫—১৩৬০ সাল
প্রথম সংস্করণ
৬ই ফাল্গুন ১৩৬২
দশম সংস্করণ
মাঘ ১৪১৩
প্রকাশক
নন্দিনী গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
২৫/৪ কবি মহঃ ইকবাল রোড
কলকাতা ২৩
প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়
বর্ণ-সংস্থাপন
লোকনাথ গ্রাফিক্স
কলকাতা - ৬
মুদ্রক
প্রিন্টিং সেন্টার
১ ছিদাম মুদি লেন
কলকাতা ৬

চল্লিশ টাকা

সূচীপত্র

কবিতার কথা	৭
রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা	১৯
মাত্রাচেতনা	২৮
উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য	৩৩
কবিতা প্রসঙ্গে	৪১
কবিতার আত্মা ও শরীর	৪৪
কি হিসেবে শাশ্বত	৫১
কবিতাপাঠ	৬১
দেশ কাল ও কবিতা	৬৯
সত্য. বিশ্বাস ও কবিতা	৭৯
রুচি, বিচার ও অন্যান্য কথা	৯০
কবিতার আলোচনা	৯৯
আধুনিক কবিতা	১১০
বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ	১১৮
অসমাপ্ত আলোচনা ...	১২২

কবিতার কথা

সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্য প্রাপ্ত হয়; নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।

বলতে পারা যায় কি এই সম্যক কল্পনা-আভা কোথা থেকে আসে? কেউ কেউ বলেন, আসে পরমেশ্বরের কাছ থেকে। সে কথা যদি স্বীকার করি তাহলে একটি সুন্দর জটিল পাককে যেন হীরের ছুরি দিয়ে কেটে ফেললাম। হয়তো সেই হীরের ছুরি পরীদেশের, কিংবা হয়তো সৃষ্টির রক্ত চলাচলের মতোই সত্য জিনিস। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের এবং কাব্য সমালোচনা-নমুনার নতুন-নতুন আবর্তনে বিশ্লেষকেরা এই আশ্চর্য গিটকে—আমি যত দূর ধারণা করতে পারছি—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খসাতে চেষ্টা করবেন। ব্যক্তিগতভাবে এ সম্বন্ধে আমি কি বিশ্বাস করি—কিংবা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবার মতো কোনো সুস্থিরতা খুঁজে পেয়েছি কি না—এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলব না আমি আর। কিন্তু যাঁরা বলেন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে—পৃথিবীর কিংবা স্বকীয় দেশের বিগত ও বর্তমান কাব্যবেষ্টনীর ভিতর চমৎকাররূপে দীক্ষিত হয়ে নিয়ে, কবিতা রচনা করতে হবে তাঁদের এ দাবির সম্পূর্ণ মর্ম আমি অন্তত উপলব্ধি করতে পারলাম না। কারণ আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে, খণ্ড-বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের

আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়,—একটি পৃথিবীর-অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, সে সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়, যার ভিতর সমাজ-শিক্ষা, লোকশিক্ষা, নানা রকম চিন্তার ব্যায়াম ও মতবাদের প্রাচুর্যই পাঠকের চিত্তকে খোঁচা দেয় সব চেয়ে আগে এবং সব চেয়ে বেশি করে; কিন্তু তবুও যাদের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী, পাঠকের মন কোনো আনন্দ পায় না, কিংবা নিম্নস্তরের তৃপ্তি বোধ করে শুধু, এবং বৃথাই কাব্যশরীরের আভা খুঁজে বেড়ায়।

আমি বলতে চাই না যে, কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যাখচিত—অভিব্যক্ত সৌন্দর্য হবে না। তা হতে বাধা নেই। অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই তা হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা, ধারণা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাক্‌কল্পিত হয়ে কবিতার কঙ্কালকে যদি দেহ দিতে চায় কিংবা সেই দেহকে দিতে চায় যদি আভা তাহলে কবিতা সৃষ্টি হয় না—পদ্য লিখিত হয় মাত্র—ঠিক বলতে গেলে পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও চিন্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু। কিন্তু আমি আগেই বলেছি কবির প্রণালী অন্য রকম, কোনো প্রাক্‌নির্দিষ্ট চিন্তা বা মতবাদের জমাট দানা থাকে না কবির মনে—কিংবা থাকলেও সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করে থাকে কল্পনার আলো ও আবেগ; কাজেই চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকার মতো লুকিয়ে থাকে যেন। লুকিয়ে থাকে; কিন্তু বিশিষ্ট পাঠক তাদের সে সংস্থান অনুভব করে; বুঝতে পারে যে তারা সঙ্গতির ভিতর রয়েছে, অসংস্থিত পীড়া দিচ্ছে না; কবিতার ভিতর আনন্দ পাওয়া যায়; জীবনের সমস্যা ঘোলা জলের মৃষিকাঞ্জলির ভিতর শালিকের মতো স্নান না করে বরং যেন করে আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের

শাদা রৌদ্রের মতো;—সৌন্দর্য ও নিরাকরণের স্বাদ পায়।

এ না হলে আমরা জিজ্ঞাসা ও চিন্তার জন্যে কেন পতঞ্জলির কাছে যাব না, বেদান্তের কাছে যাব না, ষড়্‌দর্শনের কাছে যাব না, মাঘ ও ভারবির কাছে না গিয়ে? জীবনের ও সমাজের ও জাতির সমস্যার সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট আলোক চাই—অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর কাছে যাব না কেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কাছে না গিয়ে; দার্শনিক বার্গসঁর কাছে যাওয়া উচিত, ইংলণ্ডের বা রুশিয়ার অর্থনীতি ও সমাজনীতিবিদ সুধী ও কর্মীদের কাছে যাওয়া উচিত—ইয়েট্‌সের কাব্যের কাছে, এমন কি এলিয়ট ইত্যাদির কাব্যপ্রচেষ্টার কাছেও নয়।

এখন আমি আর একটা কথা বলতে চাই খানিকটা অত্যুক্তি করেই যেন, অথচ যা অত্যুক্তি নয়—আমার কাছে অন্তত সত্য বলে মনে হয় : কাব্যের ভিতর লোকশিক্ষা ইত্যাদি অর্ধনারীশ্বরের মতো একাত্ম হয়ে থাকে না; ঘাস, ফুল বা মানবীর প্রকট সৌন্দর্যের মতো নয়; তাদের সৌন্দর্যকে সার্থক করে কিন্তু তবুও সেই সৌন্দর্যের ভিতর গোপন ভাবে বিধৃত রেখা উপরেখার মতো যে জিনিসগুলো মানবী বা ঘাসের সৌন্দর্যের আভার মতো রসগ্রাহীকে প্রথমে ও প্রধানভাবে মুগ্ধ করে না—কিন্তু পরে বিবেচিত হয়—অবসরে তার বিচারককে তৃপ্ত করে। যাঁরা এ কথা স্বীকার করেন না, যাঁরা বলতে চান যে কবিতার ভিতর প্রথম প্রধান দর্শনীয় জিনিস কিংবা সৌন্দর্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সৌন্দর্যের মতোই প্রধান জিনিস, হচ্ছে লোকশিক্ষা বা দর্শন বা নানা রকম সমস্যার উদঘাটন তাঁদের আমি এই কথা বলতে চাই যে মানুষ—সে যে অনৈতিহাসিক শতাব্দীতেই প্রথম হোক না কেন—একটা বিশেষ রস সৃষ্টি করল যা দর্শন বা ধর্ম বা বিজ্ঞানের রস নয়,—যাকে বলা হল কাব্য (বা শিল্প)—যার কতগুলো ন্যায্য পদ্ধতি ও বিকাশ রয়েছে; যার আস্বাদে আমরা এমন একটা তৃপ্তি পাই, বিজ্ঞান বা দর্শন এমন কি ধর্মের আস্বাদেও যা পাই না—এবং ধর্ম বা দর্শনের

ভিতরে যে তৃপ্তি পাই কাব্যের ভিতর অবিকল তা পাই না; পৃথিবীর শতাব্দী-স্রোতের ভিতর মানুষ যদি এমন একটা বিশেষ রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করল (কিংবা হয়তো অমানব কেউ মানুষের জন্যে সৃষ্টি করল) —কি করে সেই বিচিত্রতার নিকট তার অনধিগত, অতিরিক্ত-দাবি আমরা করতে পারি? কিংবা সেই সব দাবি কবিতা যদি মেটাচ্ছে বা মেটাতে পারে বলে মনে করি তাহলে তার ন্যায্য ধর্ম অভঙ্গুর নয় আর; তার বিশেষ স্থিতির কোনো প্রয়োজন নেই। সে যা দিতে পারে দর্শনও তা দিতে পারে, ধর্মও তা দিতে পারে; সমাজসংস্কারক জাতিসংস্কারক মনীষীরা এমন কি কর্মীরাও তা দিতে পারে। তাহলে কাব্যের স্বকীয় সিদ্ধির কোনো প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু আমি জানি কাব্যের নিজের ইন্‌টিগ্রিটির প্রয়োজন রয়েছে। এবং এই প্রবন্ধের ভিতর আমার নিজের কথারই পুনরুক্তি করে আমি বলব : 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্যবিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।' দর্শন বা সমাজ সংস্কার বা মানুষের কর্ম ও মননের জগতে অন্য কোনো বিকাশের ভিতর এই কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ঠিক এই ধরনের সারবত্তা নেই।

হতে পারে কবিতা জীবনের নানা রকম সমস্যার উদঘাটন; কিন্তু উদঘাটন দার্শনিকের মতো নয়; যা উদঘাটিত হল তা যে কোনো জঠরের থেকেই হোক আসবে সৌন্দর্যের রূপে, আমার কল্পনাকে তৃপ্তি দেবে; যদি তা না দেয় তাহলে উদঘাটিত সিদ্ধান্ত হয়তো পুরোনো চিন্তার নতুন আবৃত্তি, কিংবা হয়তো নতুন কোনো চিন্তাও (যা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে), কিন্তু তবুও তা কবিতা হল না, হল কেবলমাত্র মনোবীজরাশি। কিন্তু সেই উদঘাটন—পুরোনোর ভিতরে সেই নতুন কিংবা সেই সজীব নতুন যদি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করতে

পারে, আমার সৌন্দর্যবোধকে আনন্দ দিতে পারে, তাহলে তার কবিতাগত মূল্য পাওয়া গেল; আরো নানা রকম মূল্য—যে সবের কথা আমি বলেছি—তার থাকতে পারে, আমার জীবনের ভিতর তা আরো খানিকটা জ্ঞান বীজের মতো ছড়াতে পারে, আমার অনুভূতির পরিধি বাড়িয়ে দিতে পারে, আমার দৃষ্টি-স্থূলতাকে উঁচু মঠের মতো যেন একটা মৌন সূক্ষ্মশীর্ষ আমোদের আস্বাদ দিতে পারে; এবং কল্পনার আভায় আলোকিত হয়ে এ সমস্ত জিনিস যত বিশাল ও গভীর ভাবে সে নিয়ে আসবে কবিতার প্রাচীন প্রদীপ—ততই নক্ষত্রের নূতনতম কক্ষ-পরিবর্তনের স্বীকৃতি-ও-আবেগের মতো জ্বলতে থাকবে।

প্রত্যেক মনীষীরই একটি বিশেষ প্রতিভা থাকে—নিজের রাজ্যেই সে সিদ্ধ। কবির সিদ্ধিও তার নিজের জগতে; কাব্যসৃষ্টির ভিতরে। আমরা হয়তো মনে করতে পারি যে যেহেতু সে মনীষী কজেই অর্থনীতি সম্বন্ধে—সমাজনীতি, রাজনীতি সম্বন্ধে, মননরাজ্যের নানা বিভাগেই, কবির চিন্তার ধারা সিদ্ধ। আমাদের উপলব্ধি করে নিতে হবে যে তা নয়। উপকবির চিন্তার ধারা অবশ্য সব বিভাগেই সিদ্ধ—যেমন উপদার্শনিকের। কিন্তু প্রতিভা যাকে কবি বানিয়েছে কিংবা সঙ্গীত-বা-চিত্রশিল্পী বানিয়েছে—বুদ্ধির সমীচীনতা নয়,—শিল্পের দেশেই সে সিদ্ধ শুধু—অন্য কোথাও নয়। একজন প্রতিভাযুক্ত মানুষের কাছ থেকে আমরা যদি তার শ্রেষ্ঠ দান চাই, কোনো দ্বিতীয় স্তরের দান নয়, তাহলে তা পেতে পারি সেই রাজ্যের পরিধির ভিতরেই শুধু যেখানে তার প্রতিভার প্রণালী ও বিকাশ তর্কাতীত। শেক্সপীয়রের কথাই ধরা যাক—তাঁর এক-একটি নাটক পড়তে পড়তে বোঝা যায়, মনোবৈজ্ঞানিকর কাছে যেমন করে পাই তেমন করে নয়, মানবচরিত্র ও মানুষের প্রদেশ সম্বন্ধে নানা রকম অর্থ ও প্রভূত সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেল কাব্যের সমুদ্রবীজনের গভীরে গভীরে মুক্তোর মতো, কিংবা কাব্যের আকাশের ওপারে আকাশে

স্বাদিত, অনাস্বাদিত নক্ষত্রের মতো সব খুঁজে পাওয়া গেল যেন। কারণ এখন আমরা প্রতিভার সঙ্গে বিহার করছি সেই রাজ্যে যেটি তাঁর নিজস্ব। কিন্তু শেক্সপীয়রকে যদি ইংলণ্ডের কোনো জনসভায় দাঁড়িয়ে প্রবন্ধ পাঠ করতে হত এলিজাবেথীয় সমাজ সম্বন্ধে, আমি ধারণা করতে পারি না যে অন্য কোনো অভিজ্ঞ সমাজনীতিবিদের চেয়ে তা কোনো অংশে অসাধারণ কিছু হত(হয়তো হাসি তামাসা এবং যুক্তিহীন মুখর প্রশংসা থাকত সেই সমাজ ও সমাজপতিদের সম্বন্ধে)। কিংবা শেক্সপীয়রকে যদি ইংলণ্ডের কোনো বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে ইংলণ্ডের তখনকার রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হত, সে অভিভাষণের ভিতর কোনো বাগ্মিতা থাকত বলে মনে হয় না—তা নাই বা থাকল—কিন্তু তেমন কোনো সারবত্তাও থাকত না ইংলণ্ডের তখনকার রাজনীতিজ্ঞদের আলোচনায় যেটুকু রয়েছে; কিংবা তার ঈষৎ প্রতিবিম্বও থাকত না শেক্সপীয়রের নিজের কাব্যে অন্যরকম সারবত্তার যে আশ্চর্য ব্যাপক গভীরতা আমাদের বিস্মিত করে। বৈষ্ণব যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমাদের কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। শেক্সপীয়রের সম্বন্ধে যে কথা বললাম রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বলা চলে—সব কবির সম্বন্ধেই। অন্য সমস্ত প্রতিভার মতো কবি-প্রতিভার কাছেও শ্রেষ্ঠ জিনিস পেতে হলে যেখানে তার প্রতিভার স্বকীয় বিকাশ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সেই শিল্পের রাজ্যে তাকে খুঁজতে হবে ; সেখানে দর্শন নেই, রাজনীতি নেই, সমাজনীতি নেই, ধর্মও নেই—কিংবা এই সবই রয়েছে কিন্তু তবুও এ সমস্ত জিনিস যেন এ সমস্ত জিনিস নয় আর; এ সমস্ত জিনিসের সম্পূর্ণ সারবত্তা ও ব্যবহারিক প্রচার অন্যান্য মনীষী ও কর্মীদের হাতে যেন—কবির হাতে আর নয়।

কেউ যেন মনে না করেন আমি কবিকে কাব্যসৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো কাজ করতে নিষেধ করছি। আমি তা মোটেই করছি না। কবি তার ব্যবহারিক জীবনে কর্ম-ও-মননরাজ্যে যেখানে যে অসঙ্গতি বা

অন্ধকার রয়েছে বলে মনে করেন সব কিছুর সঙ্গেই সংগ্রাম করতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত; এই প্রবন্ধের আরম্ভেই আমি বলেছি যে তার কাব্যেও কল্পনার-ভিতর-চিন্তা-ও-অভিজ্ঞতার সারবত্তা থাকবে। আমি তার প্রতিভার স্বধর্মের কথা বলেছি; কাব্য সম্পর্কে যে জিনিসের বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে আমি করেছি; এবং ব্যবহারিক জীবনে যে স্বধর্ম অসাধারণ কিছু দিতে পারি না এমন কি কাব্যজীবনকে নষ্ট করেও দিতে পারে না বলে উল্লেখ করেছি। সে যদি বাস্তবিক কবি হয় তাহলে তার কাব্যের মতো অসাধারণ কোনো দ্বিতীয় জিনিস ব্যবহারিক জীবনের পদ্ধতি ও প্রকাশের নিকট দান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিমান লোকের মতো কর্ম ও চিন্তা দান করতে পারে সে, —ব্যবহারিক মানুষ হিসেবে। সেখানে তার কাব্যজগতে কল্পনামনীষার মুক্তি নেই—এবং তার প্রয়োজনও নেই।

যাঁরা আমার প্রবন্ধ এই পর্যন্ত অনুসরণ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে আমি বলতে চাই না যে কাব্যের সঙ্গে জীবনের কোনো সম্বন্ধ নেই; সম্বন্ধ রয়েছে—কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রকট ভাবে নেই। কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুই রকম উৎসারণ; জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পন-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা-মনীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়। কিন্তু সাধারণত বাস্তব বলতে আমরা যা বুঝি তার সম্পূর্ণ পুনর্গঠন তবুও কাব্যের ভিতর থাকে না; আমরা এক নতুন প্রদেশে প্রবেশ করেছি। পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায় কিংবা পৃথিবীর সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে এক নতুন প্রদীপের কল্পনা করা যায়—তাহলে পৃথিবীর এই দিন, রাত্রি, মানুষ ও তার আকাঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টির সমস্ত ধুলো সমস্ত কঙ্কাল ও সমস্ত নক্ষত্রকে ছেড়ে দিয়ে

এক নতুন ব্যবহারের কল্পনা করা যেতে পারে যা কাব্য; —অথচ জীবনের সঙ্গে যার গোপনীয় সুড়ঙ্গলালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ; সম্বন্ধের ধূসরতা ও নূতনতা। সৃষ্টির ভিতর মাঝে মাঝে এমন শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন অমানবীয় সংঘাত লাভ করা যায়—কিংবা প্রভূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই সমস্ত জিনিসই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথায় যেন ছিল; এবং ভঙ্গুর হয়ে নয়, সংহত হয়ে, আরো অনেকদিন পর্যন্ত, হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রালোক পর্যন্ত, কোথাও যেন রয়ে যাবে; এই সবের অপরূপ উদগীরণের ভিতর এসে হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হয়, নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে তেমনি বস্তু-সঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতরে; এবং সেই প্রতিফলিত অনুচ্চারিত দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে ওঠে যেন, সুরের জন্ম হয়; এই বস্তু ও সুরের পরিণয় শুধু নয়, কোনো কোনো মানুষের কল্পনামনীষার ভিতর তাদের একাত্মতা ঘটে—কাব্য জন্ম লাভ করে।

কবিতা মুখ্যত লোকশিক্ষা নয়; কিংবা লোকশিক্ষাকে রসে মণ্ডিত করে পরিবেষণ—না, তাও নয় কবির সে রকম কোনো উদ্দেশ্য নেই। 'কিঙ্‌লিয়ার' কিংবা 'বলাকা'র কবিতায়—এবং পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যেই কবির কল্পনা-প্রতিভার বিচ্ছুরণে, কিংবা তার সৃষ্ট কবিতার ভিতর সে রকম কোনো লক্ষ্যের প্রাধান্য নেই। কবিতাপাঠ হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র রসাস্বাদ; যার পরিচয় দিয়েছি ইতিপূর্বে। কিন্তু তবুও কবিতার সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ অন্তত দুই রকম। প্রথমত শ্রেষ্ঠ কবিতার ভিতর একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে মানুষের তথাকথিত সমাজকে বা সভ্যতাকেই শুধু নয় এমন কি সমস্ত অমানবীয় সৃষ্টিকেও যেন তা ভাঙছে—এবং নতুন করে গড়তে চাচ্ছে; এবং এই সৃজন যেন সমস্ত অসঙ্গতির জট খসিয়ে কোনো একটা সুসীম আনন্দের দিকে। এই ইঙ্গিত এত মেঘধবলিমা গভীর ও বিরাট অথচ এত সূক্ষ্ম, যে

ব্যক্তি সমাজ ও সভ্যতা তাকে উপেক্ষা করলেও (সব সময় উপেক্ষা করে না যদিও) এই ইঙ্গিতের প্রভাবে তারা অতীতে উপকৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকভাবে উদ্ধার লাভ করতে পারে। এই জন্যেই সমস্ত অতীত ও বর্তমান শ্রেষ্ঠ কাব্য তাদের নিজের প্রণালীতে মানুষের চিত্তকে যত বেশি অধিকার করতে পারবে সভ্যতার তত বেশি উপকার। কিন্তু খৃস্টান পাদরিরা যেমন জনতার হাজার হাজার বর্গ-মাইলের দিকে তাকিয়ে বাইবেল বিতরণ করেন শ্রেষ্ঠ কাব্য সে রকম ভাবে বিতরিত হবার জিনিস নয়।

এই প্রসঙ্গেই ব্যক্তি সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে কবিতার দ্বিতীয় সম্বন্ধের কথা ওঠাতে পারি। কথাটা হয়তো স্বাদহীন শোনাবে, কিন্তু আমার মনে হয়, তা সত্য। কবিতা সকলের জন্য নয়, এবং যে পর্যন্ত জনসাধারণের হৃদয় নতুন দিগ্‌বলয় অধিকার না করবে সে পর্যন্ত কয়েকটি তৃতীয় শ্রেণীর 'কবি'র স্থূল উদ্বোধন ছাড়া বাজারে ও বন্দরে—এবং মানবসমাজ ও সভ্যতার সমগ্রতার ভিতর কোনো প্রথম শ্রেণীর কাব্যের প্রবেশের পথ থাকবে না; এমন কি তা বিলাস, কল্পনাবিলাস পর্যন্ত বলে আখ্যাত হয় এবং হবে এই সব স্থূল উদগাতাদের কাছে—যদিও আমরা জানি তা কল্পনাবিলাস নয়, কিন্তু কল্পনামনীষার সাহায্যে যেন কোনো মহান—কোনো আদিম জননীর নিকট— যেন কোনো অদিতির নিকট প্রশ্ন, বারংবার প্রশ্নের বেদনা, প্রশ্নের তুচ্ছতা; বারংবার প্রতি যুগের স্তরে স্তরে যেন কোনো নতুন সৃষ্টির বেদনা ও আনন্দ; অবশেষে একদিন সমস্ত চরাচরের ভিতর সকলের জন্যে কোনো সঙ্গতির সৌন্দর্য পাওয়া যাবে বলে।

কবিতা আমাদের জীবনের পক্ষে সত্যই কি প্রয়োজন? কেন প্রয়োজন? কবিতা যে এত অল্প লোকে ভালোবাসে সেটা কি প্রকৃতিরই নিয়ম, না কি অধিকাংশের বিকৃত কি দূষিত শিক্ষার ফল? যদি আরো বেশি লোকে কবিতা ভালোবাসাতে ও বুঝতে শেখে তাহলে সেই অনুপাতে তারা ভালো করে বাঁচতে শিখবে কিনা—অর্থাৎ সেই

অনুপাতে সমাজের মঙ্গল হবে কি না? মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে সর্বাঙ্গীণ ও সুখের করে গড়বার সংগ্রামে ও সাধনায় কবিতার স্থান কোথায়?—এ প্রশ্নগুলো কোনো হিতসাধনমণ্ডলীর কর্মসচিবদের প্রশ্ন বলে মনে হয়, কিন্তু তবুও জিজ্ঞাসাগুলো নিটোল ও আন্তরিক, এবং বিশদভাবে নয়, সংক্ষেপে, হয়তো ইশারায়; এ সব জিজ্ঞাসার উত্তর আমার উপরের কয়েকটি লাইনের ভিতর নিহিত রয়েছে।

কিন্তু আসলে প্রশ্ন হচ্ছে ভিড়ের হৃদয় পরিবর্তিত হওয়া দরকার; কিন্তু সেই পরিবর্তন আনবে কে? সেই পরিবর্তন হবে কি কোনো দিন? যাতে তিন হাজার বছর আগের জনসাধারণ কিংবা আজকের এই বিলোল ভিড়ের মতো জনসাধারণ থাকবে না আর? যাতে এলিজাবেথের সময়ের ইংলণ্ডে কিংবা ধরা যাক ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে যে সব শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হয়েছে গণ-পাঠক সে সবের গভীর বোদ্ধা হয়ে দাঁড়বে? ভাবতে গেলেও হাসি পায়। কিন্তু তামাশার জিনিস নয় হয়তো। যখন দেখি শুধু তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পী ও চিত্রশিল্পীই শুধু নয়, এদিককার উচ্চতর শিল্পীরাও দিকে দিকে স্বীকৃত হচ্ছে তখন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় প্রথম শ্রেণীর কবি নির্বাসিত হয়ে রয়েছে কেন? কিন্তু যখন দেখি তথাকথিত সভ্যতা কেনো এক দারুণ হস্তীজননীর মতো যেন বুদ্ধি-স্খলিত দাঁতাল সন্তানদের প্রসবে প্রসবে পৃথিবীর ফুটপাথ ও ময়দান ভরে ফেলেছে তখন মনে হয় যে কোনো সূক্ষ্মতা, পুরোনো মেদ ও ইন্দ্রলুপ্তির বিরুদ্ধে যা, পুরোনো প্রদীপকে যে-অদৃশ্য হাত নতুন সংস্থানের ভিতর নিয়ে গিয়ে প্রদীপকেই যেন পরিবর্তন করে ফেলে; তার এই সাময়িকতা ও সময়হীনতার গভীর ব্যবহার যেন মুষ্টিমেয় দীক্ষিতের জন্যে শুধু—সকলের জন্যে নয়—অনেকের জন্যে নয়।

কিন্তু তবুও সকলের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে কি? কবে? কে আনবে? কবিকে কি শিক্ষার অধিনায়ক সাজতে হবে? সৌন্দর্যপ্রবাদে স্পন্দিত করে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করতে হবে? প্রপাগ্যাণ্ডা করতে

হবে? ডিক্টেটর সাজতে হবে জীবনের সঙ্গতি ও সুষমার সাধনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে? যদি কোনো শেষ বৈকালিক ইন্দ্রজালে আজকের এই সভ্যতার মোড় ঘুরে যায় তাহলে কবিকে কিছুই করতে হবে না আর: তার নিজের প্রতিভার কাছে তাকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে শুধু কতিপয়ের হাতে তার কবিতার দান অর্পণ করে; যে কতিপয় হয়তো ক্রমে-ক্রমে বেড়েও যেতে পারে—মানুষের হৃদয় তার পুরোনো আপোষ-অবলেপের ভিতরে আর থাকতে পারছে না বলে। আর যদি সভ্যতার মোড় ঘুরে না যায় তাহলে কমরেডের দল এবং সাহিত্যের হব্‌গব্লিনেরা কাব্যের জন্যে একটা কিছু করবেনই নিশ্চয়। সাহিত্যজগতে গ্যয়টে বা ল্যাম, কিংবা তাঁর নিজের ভাবে পেটার, অথবা রবীন্দ্রনাথ অথবা ইয়েটস্ কিংবা স্বসৃষ্ট পরিধিবিশেষের ভিতর এলিয়ট ইত্যাদির মতো প্রকৃষ্ট রসবোদ্ধাদের কথা ছেড়ে দিলেও বিদেশে বুর্জোয়া শ্রেণীদের ভিতরেও এমন অজস্র খাঁটি রসবোদ্ধা আছে যার হীন ভগ্নাংশও আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সমাজে নেই; এ দেশে রসবোধ যে হৃদয়হীন ভাবে বিরল, কবির কোনো-কোনো শিথিল মুহূর্তের নিকট এর তিক্ততাও কম নয়।

কিন্তু সভ্যতার মেদ ও ইন্দ্রলুপ্তির যদি পুনর্যৌবন না ঘটে, যিনি তৃতীয় শ্রেণীর কবি নন, অতএব স্বখাত সলিলে ধাতস্থ আমাদের দেশের সাহিত্যকর্মীদের সহানুভূতি যাঁর জন্যে একটুও নেই, তিনি কি করবেন? তিনি প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতরে চলে যাবেন—শহরে বন্দরে ঘুরবেন—জনতার স্রোতের ভিতর ফিরবেন—নিরালম্ব অসঙ্গতিকে যেখানে কল্পনা-মনীষার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আঘাত করা দরকার নতুন করে সৃষ্টি করবার জন্যে সেই চেষ্টা করবেন; আবার চলে যাবেন, হয়তো উন্মুখ পঙ্গুদের সঙ্গে করে নিয়ে, প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর; সেই কোন আদিম জননীর কাছে যেন, নির্জন রৌদ্রে ও গাঢ় নীলিমার নিস্তব্ধ কোনো অদিতির কাছে।

তার প্রতিভার কাছে কবিকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে; হয়তো কোনো

একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে তার কবিতাবৃত্ত প্রয়োজন হবে
সমস্ত চরাচরের সমস্ত জীবের হৃদয় মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ ফসলের খেতে
বুননের জন্যে।

১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা

একাশী বৎসরে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ হল।

রবীন্দ্রসত্তার সঙ্গে বাঙলাদেশের প্রকৃতি ও বাঙালী জাতি, কোনো চিরায়ুষ্মান শরীরে তার মন আত্মার মতো, যে রকম মিশে রয়েছে, অন্য কোনো একজন ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে তাদের সে রকম মিলন কোনো দিনও হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রতিভার বিচিত্র দানের কথা অনেকদিন থেকে আমাদের দেশে ও সমস্ত পৃথিবীতে আলোচিত হয়ে আসছে। কিন্তু আমার মনে হয় আমরা এখনো রবীন্দ্রনাথের আনুপূর্বিক ভাস্বরতার এত বেশি নিকটে যে ইতিহাসের যেই স্থির পরিপ্রেক্ষিতের দরকার একজন মহাকবি ও মহামানবকে পরিষ্কার ভাবে গ্রহণ করতে হলে, আমাদের আয়ত্তে তা নেই। তৎসত্ত্বেও আমরা অনুভব করি রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষা, সাহিত্য, জীবনদর্শন ও সময়ের ভিতর দিয়ে সময়ান্তরের গরিমার দিকে অগ্রসর হবার পথ যে রকম নিরঙ্কুশভাবে গঠন করে গেছেন পৃথিবীর আদিকালের মহাকবি ও মহাসুধীরই তা পারতেন; ইদানীং বহুযুগ ধরে পৃথিবীর কোনো দেশই এরকম লোকোত্তর পুরুষকে ধারণ করেনি।

আধুনিকবাংলা কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমি আমার মতামত ব্যক্ত করতে অনুরুদ্ধ হয়েছি। এ সম্পর্কে অবশ্য অনেক কথা বলবার ছিল, কিন্তু আজ এই বিশেষ দিনে এ সম্পর্কে দু-একটি কথা ছাড়া আমি অতিরিক্ত বাগ্‌বিস্তার করতে যাব না; রবীন্দ্রনাথ ও তৎপরবর্তী আধুনিক বাংলা কাব্যের থেকে কবিতা বা কবিতার পংক্তিবিশেষ উদ্ধৃত করে এ প্রবন্ধ স্ফীত করবার চেষ্টা আমি করব না।

সকল দেশের সাহিত্যেই দেখা যায় একজন শ্রেষ্ঠতম কবির কাব্যে তাঁর

যুগ এমন মানবীয় পূর্ণতায় প্রতিফলিত হয় যে, সেই যুগের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পথে যে-সব কবি নিজেদের ব্যক্ত করতে চান, ভাবে বা ভাষায়, কবিতার ইঙ্গিতে বা নিহিতঅর্থে, সেই মহাকবিকে এড়িয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

অবশ্য এড়িয়ে যাওয়াটাই আসল কথা নয়; অর্থহীন অসন্তোষে বা দুর্বল বিদ্রোহের অভিমানে আমি আমার পূর্ববর্তী বড় কবিকে ডিঙিয়ে গেলাম অকাব্যের জঞ্জালের ভিতর—সাহিত্যের ইতিহাসে এ রকম আন্দোলনের কোনো স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি দু-একজন কবির ভিতরে আমরা অরাবীন্দ্রিক সুর পাই বটে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ আধুনিকতার প্রবর্তক নন। তিনি রবীন্দ্রপূর্ববর্তীও নন। তাঁর কবিতায় আমরা অতীত বাংলা কাব্যের দু-একটা বিশিষ্ট লক্ষণের উৎকর্ষ দেখতে পাই। এর চেয়ে বেশি কিছু পাই বলে মনে হয় না। আমরা মনস্বী অগ্রজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব এ রকম একটা পরামর্শ এঁটে নতুন কবিরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। প্রত্যেক বিশিষ্ট কবিই তাঁর যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভাবনাপ্রতিভার আশ্রয়ে যখন কবিতা লিখতে যান, তখন তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা বিচিত্রভাবে সৃষ্ট হয়—এমন একটা অপরূপ সঙ্গতি পায় যা তাঁর কবিতায়ই সম্ভব—অন্য কারু কবিতায় নয়। আজকাল বাঙলাদেশে যাকে আধুনিক কবিতা বলা হয়, তার জন্মের ইতিহাস সম্পর্কে যদি উপরের কথাটি প্রয়োগ করতে পারি তবেই তা সার্থক।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার উদয়ের আগে রবীন্দ্রকাব্যের আওতার থেকে বেরিয়ে পড়বার দু-একটা প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। সে ইতিহাসের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় আঙ্গিকের অনুশীলনের জন্যেই বিখ্যাত। তিনি (মহৎ কবির নয়, সুকবির) শব্দ ও ছন্দকেই ভালোবেসে গেছেন। তাঁর কবিতায় মননধর্মের অভাব অত্যন্ত শোকাবহ ভাবে আমাদের আঘাত করে। কিন্তু আঙ্গিকের দিকেও সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে

যেতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। বাংলা ভাষায় যুক্ত-অক্ষরের পূর্বস্বরকে যে আমরা গুরু বা দু-মাত্রায় উচ্চারণ করি, রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দেই তার প্রথম পরিষ্কার নমুনা দেখতে পাওয়া যায় সত্যেন্দ্রনাথের আবির্ভাবের অনেক আগে। সত্যেন্দ্রনাথ এই প্রবর্তনাকে প্রয়োগ করে গেছেন তাঁর নানা ছন্দে।

রবীন্দ্রোত্তর প্রকৃত আধুনিক কবিতার অভ্যুত্থান হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে। এ কবিতা আধুনিক কিনা—এ কবিতা কিনা—এ কাব্যে কোনো স্বকীয়তা আছে কিনা—এ কবিতার বক্তব্য কী—আধুনিক কবিদের বার-বার এই সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যে রয়েছে একটি বিস্তৃত যুগের প্রাণপরিসর এবং এমন অনেক কিছু যা সময়াতীত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই সময়োত্তর কবিতাগুলোকে এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণে তাঁর গতিশুদ্ধ, প্রখর, জাগ্রত মনের প্রবন্ধগুলোকে যদি বাদ দিই তাহলে দেখতে পাই যে তাঁর প্রকৃত কাব্যলোকে সমাজ-ও-ইতিহাস-চেতনা একটা নির্ধারিত সীমায় এসে তারপর মন্থর হয়ে গেছে। আধুনিকের কবিতা সেই কিনারার থেকে সূত্র তুলে নিয়ে যে ধরনের সমাজ ও ঐতিহ্য বোধের আশ্রয় গ্রহণ করেছে তার পরিচয় রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়া যায় না বললে উক্তি অসঙ্গত হবে, কারণ রবীন্দ্রকাব্য বিরাট সমুদ্রের মতো—কিন্তু তাঁর শেষ জীবনের কবিতায়ও—'পুনশ্চ' 'রোগশয্যায়' 'আরোগ্য' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থেও—এই জিনিস রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান স্মরণীয় বিষয় নয় বলে কবি এর দিকে সম্পূর্ণ মনঃক্ষেপ করতে উদাসীন এবং এর প্রকাশ তাঁর কাব্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বাক্ষর থেকে বঞ্চিত। এইখানেই কোনো-কোনো আধুনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অমিল। দৃষ্টিভঙ্গির এই ব্যতিরেকী গতির জন্যে আধুনিক বাংলা কবিতার চিন্তা ও ভাষা রবীন্দ্রকাব্যের থেকে পৃথক পথে চলতে শুরু করেছে—এইটুকু মাত্র বলতে পারা যায়। কিন্তু তবুও বাংলার মাটিতে রবীন্দ্রনাথের যুগে এসে যারা ভাবাবেগ ও রোমান্টিসিজম্‌কে সংহত করে কবিতার ভিতরে তীথিকের মতো তপঃশক্তি অথবা হোরেসের রীতি অথবা নিজেদের হৃদয়ের

ঈষদঙ্কুরিত অন্য এক সংহতি আনতে চায় তারা তাকিয়ে দেখে উপরে—নিচে—সম্মুখে রবীন্দ্রকাব্যের অনপনেয় ছায়ায় তাদের স্বাবলম্বনের বিবর্তন চলেছে।

আধুনিকেরা তা জেনে নিরুৎসাহ নন। এমন একটা বিড়ম্বিত যুগের শেষে এসে তাঁরা দাঁড়িয়েছেন এবং সম্মুখে এমন গভীরতর কুমন্ত্রণা যে আজ পর্যন্ত তাঁদের সাহিত্য উল্লেখযোগ্য হোক বা না হোক তাঁদের নতুন নতুন মনোভাব লক্ষ্য করবার বিষয়। অনেকের ধারণা বর্তমান বাংলা কবিতা মোটা চালে ও গদ্য ছন্দেই চলে ভালো। কিন্তু সে ধারণা ঠিক নয়। যেখানে আধুনিক কবিতা সূক্ষ্ম সুর বজায় রেখে চলছে সেখানে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য আয়ত্তে রাখবার জন্যে রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে অজ্ঞাতসারে, এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর চেতনায়, তাকে স্বভাবতই গভীর সংঘর্ষে আসতে হয়েছে। কেননা এ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নিতান্তই নিজস্ব জিনিস নিয়ে আধুনিকের বোঝাপড়া। এই সংঘর্ষে যে আধুনিক কবিতার নিজস্বতা ম্লান হয়নি তাকে বাঙলাদেশের বর্তমানকালের অল্পাধিক বিপ্লবাত্মক ভাববাদী কবিতা বলা যেতে পারে। বিপ্লব সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই শুধু নয়, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে গোটা পরিপ্রেক্ষিতের মুখে দাঁড়িয়ে এ বিপ্লব পূর্ণতর সমীকরণের চেষ্টায় অর্থাৎ সৃষ্টিরহস্যের নতুনতর অর্থসন্ধানে ব্যস্ত। কাজেই এ সব কবিতার জীবনদর্শন রবীন্দ্রকাব্যের জীবন-দেবতাবোধের চেয়ে অন্য জিনিস। রবীন্দ্রকাব্যের অর্থগৌরবের থেকে এ সব আধুনিক কবিতার নিহিত অর্থ পৃথক হওয়ার দরুন প্রকাশের ভঙ্গিও স্বভাবতই অন্য রকম হয়েছে। কিন্তু বর্তমান কোনো কোনো কবির পক্ষে এই ধরনের সার্থক কবিতা লেখার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে এই যে গত মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ইংরেজি কবিতার বিরাট ট্রাডিশন ও আমাদের দেশে স্বয়ং রবীন্দ্রের সৃষ্টি-রহস্যোৎসারিত বড় কাব্যের পরে নতুনতর বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েও বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে নতুন দায়িত্বপূর্ণ মহদুক্তি করবার মতো ভাবনা-প্রতিভার একান্তই অভাব—স্বদেশ ও বিদেশের আধুনিকদের মধ্যে। বিদেশের আধুনিকেরা এখন সকলেই প্রায় স্বচেষ্টায় বা অচেষ্টায় লোকায়ত; আমরাও

তাদেরই মতন। আমার মনে হয় বাঙলাদেশে আধুনিক কালে দু-একটি কবির মুষ্টিমেয় কবিতায় মাত্র কাব্যে বিশ্ববোধ সম্পর্কিত এই দিকটা কিছু পরিমাণে সফল হয়েছে।

আমাদের দেশে যে-সব নতুন কবিরা দিব্যানুভূতিকে ঘৃণা করেন এবং স্থূল ও চিক্কণ সুর মিশিয়ে কবিতা লেখেন—পদ্যে বা গদ্যছন্দে—তাঁদের কবিতা প্রধানত শ্লেষাত্মক এবং বর্তমান কালের সমগ্র পৃথিবীর সমাজব্যবস্থায় অন্যায় ও অত্যাচারের মুখোস বার করে ফেলবার জন্যে প্রযুক্ত। রবীন্দ্রনাথও তাই চান, কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন প্রায়শই বিশুদ্ধ কাব্যের আবেগে। কিন্তু এঁদের মনোবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এইজন্যেই বিভিন্ন যে এঁরা সাহিত্যে কল্পনা-প্রতিভার দাবি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে অকাতর ভাবে মননজীবী এবং কবিতায় বিশুদ্ধ রসের কোনোরকম অবতারণার বিরোধী। আধুনিক বাংলা কবিতায় এই সব কবিই গদ্যপ্রায় পদ্যছন্দ অথবা গদ্যছন্দ অবলম্বন করে চলেছেন—এবং বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার শববাহনের কাজ চলেছে এঁদের কবিতায়। কিন্তু এসব লেখায় কোনো নতুন আশা ও দীপ্তির পরিচয় পাওয়া গেলে এহেন আধুনিক বাংলা কবিতার উপকার হত—সে পরিচয় তাঁদের আঙ্গিকে সঞ্চারিত হলে পদ্য বা গদ্য শরীরেও কবিতার জন্ম হত—আশা করা যায়।

এই দিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে এ-সব রচনার প্রভেদ এই যে উক্ত কাব্যের সব চেয়ে বেশি বেদনা সব চেয়ে বেশি চেতনারই পরিচায়ক; সমাজ বা ইতিহাসের চেতনার নাম করে, এবং কখনো অবচেতনাকে আশ্রয় করে, কখনো বা তাকে ব্যঙ্গ করে, তা পরিণামে ত্রিশঙ্কু হয়ে ঝুলে থাকে না। কেউ-কেউ বলবেন কালের মুকুর হিসেবে সাহিত্যকে মেনে নিলে এই বিচ্ছিন্ন যুগে শুদ্ধ কবিতার কোনো মানে হয় না। কিন্তু সাহিত্যকে যদি যুগের দর্পণ হিসেবেই শুধু স্বীকার করে নেয়া যায়, একটি ক্ষয়িষ্ণু যুগের নির্মম দর্পণ হয়েও সাংবাদিকী ও প্রচারমর্মী রচনার সঙ্গে কবিতার পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত জিনিসগুলোর ভিতর

অভিজ্ঞতা-বিশোধিত ভাবনাপ্রতিভার মুক্তি, শুদ্ধি ও সংহতি কিছুই নেই, কবিতায় তা আছে।

আধুনিক বাংলা কবিতার উল্লেখযোগ্য দিকটার অভ্যুত্থান হল নতুন সময় তার নতুন দায়িত্ব নিয়ে এসেছে বলে। মধুসূদন যেমন বিদেশী সাহিত্যিকদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী—রবীন্দ্রবঙ্কিমও তাঁদের কাছে অল্পাধিক গিয়েছিলেন—বর্তমান কবিদেরও অল্পবিস্তর পরস্পরনিঃসক্ত বিশেষ-বিশেষ গোষ্ঠী তেমনি বোদেলেয়র ও ফরাসী প্রতীকী কবিদের থেকে শুরু করে ইয়েটস, এলিয়ট ও পাউণ্ড-এর কাছে গেলে খানিকটা হৃদয়ের সাহচর্য ও কিছুটা অভিনবত্বের গরিমা সে সব জায়গায় খুঁজে পেয়েছে বলে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার চর্চা আধুনিক বাঙালী কবির তেমন মন যোগাত না; অন্তত যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে তারা বিস্পষ্ট সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পল ভারলেন, রঁসার ও ইয়েটস ও এলিয়ট-এর সদর্থক বা নঙর্থক মননবিচিত্রতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর কাব্যালোক থেকে উচ্চারণ করলেন 'এ পাখার বাণী', যেখানে শেষ পর্যন্ত কবিগুরুর অভাবনীয় ভাবনাপ্রতিভা আমাদের জানিয়ে গেল যে 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ', তখন এ জিনিসকে মর্মান্তিক শ্রদ্ধায় সমসাময়িকতার অস্বাচ্ছন্দ্যের থেকে ঘুচিয়ে দিয়ে আধুনিকেরা—বর্তমান সময়ের জন্যে অন্তত—আধুনিকেরা—গ্রহণ করলেন এলিয়টকে, যখন তিনি বলছেন :

In this last of meeting places
We grope together
And avoid speech
Gathered on the beach of the humid river
Sightless, unless
The eyes reappear
As the perpetual star
Multifoliate rose

Of death's twilight kingdom
The hope only
Of empty men.

আধুনিকদের একটা বিশিষ্ট পক্ষ, এবং অল্পাধিকভাবে সকলেই, মনে করল সমগ্র পৃথিবীর বর্তমান যুগের 'ওয়েস্টল্যাণ্ড'-এর সুর এলিয়ট-এর মতো কে আর ব্যক্ত করতে পেরেছে? কিন্তু কাব্যকে যদি 'ওয়েস্টল্যাণ্ড'-এর যুগের প্রতিবিম্ব হিসেবে গ্রহণ করতে হয়—এই শুধু, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়—তাহলে এলিয়ট-এর কাব্য সে রকম বিম্বন বটে—সর্ব সংস্কার মুক্ত হয়ে। বিশেষ সময়চিহ্নের ছাপ তার উপর এমন জাজ্বল্যমান যে তা আজ না হোক, কাল অন্তত ফিকে হয়ে যাবে।

এলিয়টকে সমর্থন করা হল এবং রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কারুকারু অভিযোগ হল এই যে তিনি ঐশ্বর্যশালী লোক ও জনসাধারণের আন্দোলনের থেকে বিচ্ছিন্ন, তিনি আধ্যাত্মিক সত্যে বিশ্বাসী ও বুর্জোয়া সভ্যতার প্রতীক। এসব ব্যাপার চুলচেরা তর্কেরই জিনিস বটে। যে সব অসাহিত্যিক তা করবে, তারা তা করুক। আমরা এবং বাংলার ঐতিহ্যের মনীষী ছাত্রেরা আমাদের সমর্থন করে এই কথা বলবে যে রবীন্দ্রসাহিত্য ও কবিজীবন দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড গঠন করতে গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে যেভাবে নিজেকে ক্ষয়িত করেছে, বাঙলা ছাড়া অন্য কোনো দেশে হলে হয়তো বা তার অপেক্ষাকৃত সুব্যবহার হত। দ্বিতীয় অভিযোগ সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে কাব্যকে কবিমনের সততাপ্রসূত অভিজ্ঞতা ও কল্পনাপ্রতিভার সন্তান বলে স্বীকার করে নিলে, আধ্যাত্মিক সত্যে বা যে কোনো সত্যে বিশ্বাস একজন কবির পক্ষে মারাত্মক দোষ নয়—বরং শূন্যবাদের চেয়ে কাব্যসৃষ্টিকে তা ঢের বেশি জীবনীশক্তি দিতে পারে—এবং পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া সভ্যতার ভিতর লালিত হলেও তার প্রতীক যে তিনি কখনোই নন—বরং আমাদের দেশে সেই সভ্যতার প্রধান ও প্রখর সমালোচক যে তিনিই, তা তাঁর জীবন ও পলিটিকস্, তাঁর সমাজসাম্যবাদ ও সাহিত্য দীর্ঘ কাল ধরে প্রমাণ করে আসছে।

ওদিকে পাউণ্ড ও এলিয়টও বুর্জোয়া সভ্যতার জীব, এবং রবীন্দ্রনাথের

চেয়ে কখনোই সেই সভ্যতার তীব্রতর সমালোচক নন; আধ্যাত্মিক সত্যে এলিয়টও গভীর বিশ্বাসী, রবীন্দ্রনাথের উপনিষদের তত্ত্বের মতো রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম এলিয়ট-এর উপজীব্য এবং তিনিও নিঃস্বের সন্তান বা নিজে নিঃস্ব নন। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ঢের বেশি সঙ্কুচিত ও উপেক্ষণীয়। তথাপি আমি দেখেছি, বর্তমান বাঙলার কোনো-কোনো প্রখ্যাত কবি রবীন্দ্রকাব্যকে মহাসময়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে এলিয়টকে তাঁদের আচার্য বলে মনে করেন। কিছুটা নিরাসক্ত ভাবে চিন্তা করে দেখলে এ জিনিসকে ঠিক দোষাবহ বলতে পারি না তবুও। রবীন্দ্রকাব্যকে আধুনিকেরা—অন্তত আধুনিকদের একটা উৎকৃষ্ট পক্ষ—সজাগভাবে বিস্রস্ত হতে দিলেও, অবচেতনায় তাঁরই কাব্যে বরাবর অনুভাবিত হয়ে এসেছে। আমরা বিশ্লেষণ করতে বসিনি যে রবীন্দ্রকাব্য থেকে যা আমরা পেলাম তা নিসর্গের শোকাবহ প্রাচুর্যে আসে বলেই সদাসর্বদা আকৃষ্ট করে না, কিন্তু ঊনবিংশ শতকের ইয়োরোপীয় প্রতীকী কবি কিংবা তাঁদের ইংরেজ কবিশিষ্যদের কাব্য-আকুতির চেয়ে তা যেমন নিরাময় তেমনি মূল্যবান—রবীন্দ্রনাথের মহত্তর ব্যক্তিত্বের সংশ্লেষ তাতে রয়েছে।

তবুও আধুনিক কালের ভাব ও চিন্তাবৈষম্যের হেঁয়ালির ভিতরে পড়ে ক্ষয়িষ্ণুতার সুর আধুনিকদের স্পর্শ করেছে বেশি। দু-একজন কবির কিছু কিছু কবিতা ছাড়া আধুনিক বাংলা কবিতায় ভঙ্গুরতার ছাপ এমন দেদীপ্যমান যে মুহূর্তের জন্যেও রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো কবিতা বা গানের সংস্পর্শে এলে মনে হয় তাঁর সঙ্গে আধুনিকদের আদর্শগত বিসদৃশতা কী ভয়াবহ ভাবে চমৎকার! আমাদের দিক থেকে এই বিষমানুপাতিক গতির প্রয়োজন ছিল বললেই চলবে না, বর্তমান সমাজ ও ইতিহাসের দিক দিয়ে এ বিষমতা দুরতিক্রম্য হয়ে উঠেছে—কোনো মৃদুকম্পিত আধুনিকও তা এড়াতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু সমাজ ও ইতিহাস ক্ষয়িষ্ণুতা দোষে দুষ্ট হলেও কবিতা ও সাহিত্য তার ভিতরে লালিত হয়েও যদি তাকে প্রয়োগপ্রতিভার শেষ বৈচিত্র্যে কোনো-না-কোনো একরকম সঞ্চার, ইঙ্গিতের দিব্যতা, না দিতে পারে তাহলে তা

শ্লেষ বা ধ্বংস বা গঠনাত্মক গুরুতর প্রবন্ধ বা প্রচারপত্র হতে পারে, কিন্তু তাকে কাব্যসৃষ্টি বলা যেতে পারে না। আমাদের দেশে আজকাল অনেক কবির কবিতাই প্রচারপত্রিকায় পর্যবাসিত হয়েছে—অন্য-পক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে এই ক্ষয়িষ্ণুতার যুগ ও সুরকে অন্তর্গ্রথিত করে কাব্য রচনা করে গেছেন।

অবশ্য আমি আধুনিকদের সব কবিতাকেই ভঙ্গুর বা প্রচারবিষয়ী বলছি না। আমাদের দেশেও রবীন্দ্রপরবর্তীদের ভিতর এই সব নির্মাণ ও সৃষ্টির দ্বন্দ্বের ভিতর থেকে বার হয়ে আসছে সার্থকপ্রায় কবিতা, দু-চরটে সফল কবিতা।

তাহলে একথা বাস্তবিকই বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সাহায্য ও ইঙ্গিত পেয়ে আজ যে-আধুনিক কাব্যের ঈষৎ সূত্রপাত হয়েছে তার পরিণাম—বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের ভিত্তি ভেঙে ফেলে কোনো সম্পূর্ণ অভিনব জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে, সাহিত্যের ইতিহাস এ রকম অজ্ঞাতকুলশীল জিনিস নয়। ইংরেজ কবিরা যেমন যুগে-যুগে ফিরে সেক্সপীয়র-এর কেন্দ্রিকতার থেকে সঞ্চারিত হয়ে বৃত্ত রচনা করে ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে আমাদের কবিরাও রবীন্দ্রনাথকে পরিক্রমা করে তাই করবে—এই ধারণা প্রত্যেক যুগসন্ধির মুখে নিতান্তই বিচারসাপেক্ষ বলে বোধ হলেও অনেককাল পর্যন্ত অমূলক বা অসঙ্গত বলে প্রমাণিত হবে না—এই আমার মনে হয়।

১৩৪৮

মাত্রাচেতনা

কবি যখন তাঁর একটি কবিতা লেখা শেষ করেন, তখন হয় তা সফল হল, না হয় হল না। কি তা হল সব চেয়ে আগে কবির নিজেরই কাছে তা ধরা পড়বে। শিল্পীমানসের গঠনের ভিতর এই কঠিন আত্মোপকার প্রতিজ্ঞা রয়েছে; তিনি অতীত বা আধুনিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা নৈর্ব্যক্তিক যাই হন না কেন।

কবিতার সৃষ্টি করবার সময় আসে জীবনে। কবিতাটি যাতে সার্থক হয় সেই দিকেই কবির দৃষ্টি। এমন কোনো সমাজ থাকতে পারে যেখানে মোটা কাঞ্চ নমূল্যে কবিতা কেনা হয়, কিংবা তেমন কবিতা লিখতে পারলে নানা রকম সামাজিক সুবিধা পেতে পারা যায়। কিন্তু কবিতা সৃষ্টির জন্যে নিজেদের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে গিয়ে ও সেই কবিতা সৃষ্টি করবার সময় উপরোক্ত সামাজিক লাভ-অলাভের প্রশ্ন কবির বড় চেতনায় বিশেষ কোনো ছায়াপাতই করে না, তার চৈতন্য ও অনুচেতনা ঐকান্তিকভাবে সক্রিয় হয়ে থাকে কবিতাটিকে সৎ, সার্থক করে তোলবার জন্যে। এমনকি কাদের জন্যে এ কবিতা লেখা হচ্ছে—এ জিনিস তারা স্বীকার করে নিতে পারবে কিনা—মর্ম না বুঝে ক্ষুণ্ণ, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে না তো—এসব প্রশ্ন কবির এই মানসের কাছে বরং অকিঞ্চিৎকর।

কিন্তু তবুও কবিতা তার নিজেকে—ব্যাক্তি ও উত্তরব্যক্তি সত্তাকে প্রকাশ করবার একটা দিক—মহৎ দিক।

কবিতার আশ্রয় ছাড়াও সে নিজেকে প্রকাশ করে এসেছে—আদিম মানুষ যেদিন নিজেকে বোঝাবার তাগিদ বোধ করেছিল সেই অস্পষ্টতার সময় থেকে ক্রমশই স্পষ্টতর ভাবে; এই ক্রমিক নির্মলতা তার চেতনার ভিতর কাজ করে এসেছে, এবং সাংসারিক, সামাজিক প্রয়োজনে সকলের সঙ্গে মিলিত হতে হলে সেও বিশেষ কোনো অস্পষ্ট কথা বলে না, কোনো

প্রতীকের দুর্গমতা বা রূপকের আবছায়ার দিকে সহজে ঘেঁষতে চায় না আর। এখানে সে জনমানসের সঙ্গে মিলেছে। এ মানসকে কবিতার বিশিষ্ট স্বভাবের দিকে অগ্রসর করে দিতে পারা যায় কিনা—জনসাধারণের চেতনা, রুচি ও ভাষা মহত্তর করে তুলতে পারা যায় কিনা, এই সব বহুকালের চলতি সমস্যা আবার নতুন করে মেটাতে চেষ্টা করবার আগে সে বরং নিজেকে প্রায় জনসাধারণের স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে এসেছে—ভিড়ে গেছে তাদের ভিতরে।

এই রকমই চলেছে—অনেক কাল থেকে ; এবং কবিমানসের প্রমত্ততা বা তার মহাভাবনার দৌরাত্ম্য তাকে যতই নিরাবলম্ব ও অস্পষ্ট করে তুলতে চাক না কেন—পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মহাকবিই এই অস্বস্তি বোধ করেছে—জনসাধারণের নিজেদের বাচনরীতির সফল স্বচ্ছতার দাবি সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি; এ জিনিস তাকে—তার অন্তরিন্দ্রিয়কে গঠন করে আসছে সে অনেক আগেকার যুগ থেকে—এমনই ভাবে, যে কবিতা সৃষ্টি করার সময় সে তার নিজের আদর্শ উপায়কে যতটা স্বায়ত্ত মনে করুক না কেন, ততদূর স্বাধীন তা নয়। যে সময়ে সে বাস করেছে, এবং যে সময়ে বাস করেনি, যে সমাজে সে কাল কাটাচ্ছে, এবং যেখানে কাটায়নি, যে ঐতিহ্যে সে আছে, এবং যেখানে সে নেই—এই সকলের কাছেই সে ঋণী। যদিও শিল্পসৃষ্টি করবার সময় এই ঋণ কঠিন উত্তমর্ণের মতন তাকে আক্রমণ করতে আসে না, এবং এই জন্যে উভয়-পক্ষেরই মঙ্গল, তবুও ঋণ-বিস্মরণের মানুষ কবি নয়; এ জিনিস ঋণও নয়, উপায় বরং—মর্মার্থী হয়ে বেঁচে থাকবার;—কবির অনুচেতনায় এবং কখনো-কখনো কল্পচেতনার ভিতর সঞ্চারিত থেকে তার প্রতিভাকে সাহায্য করছে তার বিশেষ অভিজ্ঞতাকে দূষিত না করে ও যতদূর সম্ভব পরার্থপর করে তুলতে।

শ্রেষ্ঠ কবিতা—অন্য যে কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পের মতো কবিমানসের আপন অভিজ্ঞতাকে যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে—নিঃস্বার্থ জিনিস। কবিতা কবির নিজের ও পরিজনদের নিকটে গণ্য হয়েই পর্যবসিত হলে সেই কাব্য সম্বন্ধে

স্বভাবতই বিরূপ প্রশ্ন ওঠে। সে কাব্য নিজেকে সর্বৈব চেতন বলে মনে করে নিলেও সন্দেহ থেকে যায় যে ইতিহাসধারার অনুগত কবি সে ইতিহাস ও সমাজ পরিচ্ছন্নভাবে মর্মস্থ করতে পেরেছেন কি? তাহলে তার কবিতা শব্দ ইঙ্গিত ও প্রতীকের—ভাষণ রীতির ব্যবহারে এ রকম সজীবতার পরিচয় দিলেও (যেমন অনেক বিদেশী ও দেশী আধুনিক কবিতায় দেখা যায়)—ফলত এমন অস্ফুট ও অসার কেন?

এই যুগই অস্পষ্ট, এই ইতিহাসই অন্তঃসার হারিয়ে ফেলেছে—এসবের আশ্রয়ী শিল্পও তাই এই রকম—একথা বলে এ প্রশ্নের একটা উত্তর দেওয়া চলে। কিন্তু আমার মনে হয় এ উত্তর—হয়তো সদুত্তর—তবুও আজকের কবির পক্ষে তার কবিমানসের নিরিখ হিসেবে গৃহীত হতে গেলে তাকে ও তার পাঠকসমাজকে কোনো শান্তি দিতে পারবে না আর। এই শান্তি পেতে হলে মাত্রাচেতনায় পৌঁছানো চাই—জীবনে ও কবিতায়। যতদূর দৃষ্টি যায় জীবনের ও ইতিহাসের সত্যের ওপিঠ ও এপিঠের অন্তিমবর্ণে নিজেকে—মানবকে ফলিয়ে তুলে—তবুও এমন একটা সঙ্গতির আভাস পাওয়া যায়—যা কঠিনতম আনন্দ একজনের কাছে, সফলতম বেদনা অন্যের নিকটে—তবুও তাদের প্রাণে এক সুরসাম্যের জন্ম দেয়; মহাসময়ের ভিতর দিয়ে চলতে-চলতে শতছিন্ন অন্তরিন্দ্রিয়কে আবার ছেদ করে এ এক মনোমৈত্রী। কবিতা পাঠ করে উপনিষদরসিক কেউ হৃদয়কে আনন্দে শুদ্ধ করে নিতে চায়, অন্যরকম লোক বেদনায়, আরিস্টটলের নাতিশিষ্যেরা নিবিড় অশ্রুতে। কবিতা পড়ে মূল্যচেতনা বাড়বার কথা; অভিজ্ঞতা সিঁড়ির মতো এসে নিজেকে দেখিয়ে দেয়। কিন্তু এই সবের থেকেই হৃদয়ে পরিণামে প্রশান্তির জন্ম হয়। বিদেশী বা দেশী আধুনিক কবিতায় যেখানেই প্রশান্তি—এ মাত্রাচেতনা—রয়ে গেছে প্রকৃতির—ও নিয়তির—ও স্বায়ত্ত মানুষের সমস্ত রিরংসা ও রিপুর ফলাফল গ্রাহ্য করে, সেখানেই তা আমাদের নিজেদের জিনিস—তাকে যতই কম্যুনিস্ট বা বুর্জোয়া বলে অভিভূত করে দিতে যাই না কেন।

সময় ও পৃথিবী অভিজ্ঞতার আধার। কবিও সঞ্চয়ী। কিন্তু তার আনীত

অভিজ্ঞতা কতখানি সার্বিক, কতখানি তার নিজের, এবং নিজের অভিজ্ঞতাকে কতদূর অপরের করে তুলতে পারা যায়—সকলকে না হোক, অনেককেই পরিদীক্ষিত করতে পারা যায় নিজের মূল্যজ্ঞানের চেতনায়—এ দায়িত্ব কবির। নগরে বাজারে লোকসমাজে সাধারণ স্পষ্ট কথায়—কথায় মাত্র—এ দায়িত্ব পূর্ণ করতে গেলে তাকে ব্যাহত হতে হবে। কারণ সে সাংবাদিক নয়, অর্থ-রাজনীতিকও নয়। কিন্তু তার কথা আলাপের পর্যায়ে উঠে, ভাষায় তরঙ্গায়িত হয়ে অসাধারণ হয়ে উঠলেও স্পষ্টতা হারিয়ে ফেলবার কোনো নির্দেশ নেই তার—না সমাজ না সময় না নিজের সংহত ভাবনা প্রতিভার কাছ থেকে; কিংবা তার ব্যক্তি স্বরূপের কাছ থেকে—যা আজকের জিনিস নয় শুধু, মানুষকে মানুষের নিঃশেষে বুঝবার ও বোঝাবার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার ভিতর থেকে যার জন্ম।

কিন্তু তাই বলে কবিতার মানে পাঠকসমাজে নির্বিশেষে বিমুক্ত করতে গিয়ে যে যুগে ও যে দেশে আমি রয়েছি সেখানকার মানুষের মুখের ভাষায় কবিতা লিখব—এ রকম বা যে কোনোরকম সংকল্পে কবিতা উতরায় না, সংকল্পের সঙ্গে কবিতার কোনো সংস্রব নেই বলে নয়; সংস্পর্শ রয়েছে; সার্থক কবিতা হয়তো মুখের ভাষায়ই ফুটে উঠবে, কিংবা ঠিক মুখের ভাষা নয় এমনি কোনো ভাষায়; কিন্তু কোনো বিশেষ বাগরীতিতে বা অর্থে লেখা উচিত—এই সংকল্পের ভিতর থেকে নয়। কবির মনে একটি মাত্র সংকল্প থাকে এই : যে জিনিস হয়তো আমিই শুধু জেনেছি সেই সম্পর্কে আমার স্থাপনা-শক্তিকে স্পষ্টতা, আমার আত্মপ্রত্যয়কে সুস্থিরতা দেবার জন্যে আমি তাকে তার সব চেয়ে স্পষ্ট স্বভাবপ্রতিভার ভিতর দেখব : অপরকে দেখাবার বা জানাবার আগে নিজের ব্যক্তিপুরুষকে চরিতার্থ করে নেবার জন্যে। এই ভাবে কবিতা লেখা হলে—আত্মোপকারী মন প্রশান্তি বোধ করলে—কবিতা অনন্যসাধারণ হয়েও সহজেই অপর সাধারণের কাছে ধরা দেয়, কোনো অপ্রাসঙ্গিকভাবে সংকল্পিত কবিতার চেয়ে।

সৃষ্টি করবার সময় কবির একমাত্র উদ্বেগ কি হওয়া উচিত, আধুনিক কবিরা অনেকেই তা জানেন (যদিও জেনে না জানার ভান করে কেউ-

কেউ সংস্কারমুক্তি অনুভব করেন), কিন্তু তবুও তাঁদের কারো-কারো দু-একটি কবিতাসৃষ্টি তাঁদের নিজেদেরই অনেক কবিতার নির্মাণকৌশলের পাশে জাজ্বল্যমান হয়ে রয়েছে। সবচেয়ে আগে অভিজ্ঞতা সমাজ বা রাষ্ট্রনীতিকের চোখে সত্য হয়ে উঠুক, কোনো তৃতীয় মানসের আশ্রয়ে কাব্যে পরিণত হবার মতো অভিজ্ঞতা আজকের পৃথিবীতে নেই, একথা কোনো আধুনিক কবি বিশ্বাস করেন কিনা জানি না। যদি করেন তাহলে নিজের লেখাকে কবিতা মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ থাকে না।

কি করে তা হয় সে অন্য কথা, কিন্তু কবিতা রূপ পরিগ্রহ করে একটা অমেয় পরিধির ভিতর যেন—যাকে পাতালেও দেখা যায়, এবং নীলিমায়, কিন্তু প্রধানত এই পৃথিবীর ভিতর, জনসমাজে; কিন্তু মানবসমাজে অগ্রসৃতির বাহন বলে গণ্য হয়েও এবং সর্বত্র উপস্থিত থেকেও শঙ্খরেখায় অগ্রসর হবার তাৎপর্য তার নিজের ভিতরে হয়তো নেই জেনে আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ কিংবা আগামীকালের কবিতা—আমাদের এই পৃথিবী মোটামুটি এ রকম ভাবে চললেও একটা সুরসাম্য লাভ করতে পারবে আশা করা যায়; এবং ভাষার প্রসাদ; যার অভাবে আধুনিক অনেক কবিতা ব্যাহত হয়ে যাচ্ছে।

১৩৫১

উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য

একজন আধুনিক ইংরেজ কবি—অডেনের মতে কবিতা হচ্ছে 'মেমোরেবল্ স্পীচ্'! কবিতার এ রকম সংজ্ঞা দিয়ে তিনি কবিতার পরিপ্রেক্ষিত ও পটভূমি অতিরিক্ত রকমে প্রসারিত করে দেখেছেন। অডেন ও তাঁর সুধী বন্ধু-বান্ধব আধুনিক অনেক ইংরেজ কবির কাছে তাই স্মরণীয় গদ্যও হয়তো কবিতা বলে কেটে যাবে।

মানুষ হিসেবে অনুদার আমি হতে পারি, কিন্তু সময়-ও-সীমা-প্রসূতির ভিতর সাহিত্যের পটভূমি বিমুক্ত দেখতে আমি ভালোবাসি। তবু আমি এটা স্বীকার করব না যে 'মেমোরেবল্ স্পীচ্' মাত্রই কবিতা। কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। কাল বা সময় বৈনাশিক; কিন্তু সে সেই সমস্ত কুয়াশাগুলোকেই কেটে-কেটে চলেছে যা পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়াবার পক্ষে অন্তরায়ের মতো।

এই সমস্ত চেতনা নিয়েই মানবতার ও কবিমানবের ঐতিহ্য। কিন্তু এই ঐতিহ্যকে সাহিত্যে বা কবিতায় রূপায়িত করতে হলে ভাব-প্রতিভার প্রয়োজন—যা প্রজ্ঞাকে স্বীকার করে নিয়ে নানারকম ছন্দে অভিব্যক্ত হয়। ছন্দের অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে; গদ্যও তো একরকম ছন্দ। কিন্তু তবুও যদি বলি—কবিতা স্মরণীয় বচনমাত্র, তাহলে ঠিক হবে না। যদি বলা যায় যে, কবিতা স্মরণীয়তম বাণী, তাহলেও অবান্তর পরিসরের প্রকোপে ঠিক জিনিসটাকে আমরা সব সময় চিনে নিতে পারব না। তবুও অবিস্মরণীয় বাণী ছাড়া কবিতার অন্য কোনো সংজ্ঞা সম্প্রতি আমি খুঁজে পাচ্ছি না। একটি পুরোনো শব্দকে হয়তো বা খানিকটা নতুন অর্থ দান

করে ধরে নিয়েছি—ধ্বনি-ও-চিন্তার মর্যাদায় বাণী এ রকম যে, তার পক্ষে অবিস্মরণীয় হওয়া বেশি সহজ ও স্বাভাবিক—উক্তি প্রভৃতির চেয়ে। এতে অতি বিশুদ্ধ কাব্যামোদীরা কিছু অপ্রীত হবেন হয়তো। কিন্তু তার চেয়েও বেশি বিস্মিত ও বীতশ্রদ্ধ হবেন উত্তরৈবিক কয়েকজন কবির কাব্যের মারফত ঘোষিত কবিতাবিষয়ক অভিজ্ঞানপত্রের মর্ম উপলব্ধি করে। স্মরণীয় উক্তিকেই এরা কবিতা বলে মেনে নিয়েছে। সে উক্তি কোনো-কোনো সময়ে নিছক গদ্যে পর্যবসিত এবং স্মরণীয় নিশ্চয়ই, কিন্তু কী হিসেবে—সেটা সহসা বুঝে উঠতে পারা যায় না। তা ছাড়া যা স্মরণীয় তা সব সময়ে মনে নাও থাকতে পারে, কিন্তু যা অবিস্মরণীয় তা থেকে যায়।

একজন আধুনিক কবির 'উটপাখি' ও অপর আধুনিকের 'নাগরিক' পড়ে মনে হয় যে তাঁরা যা লিখেছেন সবই প্রায় বক্তব্য হিসেবে মনে রাখবার মতন জিনিস; কিন্তু আমার মতে প্রথমটিতে পাওয়া যাবে স্মরণীয়তর বাণী এবং দ্বিতীয় কবিতার লাইন কটি স্মরণযোগ্য বাক্যের সমষ্টিমাত্র—জীবন-সমালোচক এখানে হয়তো নিরেট সাংবাদিকতার দেয়াল টপকে যেতে পেরেছেন, কিন্তু প্রজ্ঞাদৃষ্টি দিয়ে ভাবপ্রতিভাকে শুদ্ধ করে নিয়ে তেমন কোনো জীবনদর্শন সৃষ্টি করতে পারেননি, যাকে কবিতা বলতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতায় উক্তির স্মরণযোগ্যতার প্রাচুর্যই খুব বেশী; ইংরেজিতে যাকে বলে 'ক্লেভারনেস', ঠিক সে জিনিস নয়—তার চেয়ে খানিকটা উঁচু তারে বাঁধা লাইন ও পংক্তির সমষ্টিই ঢের বেশি। একেই অনেকে কবিতা বলতে চায়। আধুনিক ইংরেজি কাব্যের ক্ষেত্রেও দেখি এ রকম লাইন ও 'স্ট্যান্জা' নিয়ে যা সৃষ্টি হচ্ছে তাই কাব্য বলে পরিচিত হয়ে আসছে।

কোনো একটি বিখ্যাত আধুনিক ইংরেজি কাব্য-সংকলনে নিচের লাইন কটিকে মোটেই অবজ্ঞা করা হয়নি :

> Death is more than
> certain a hundred these

sounds crowds odours it
is in a hurry
beyond that any this
taxi smile or angle we do

not sell and buy
things so necessary as
is death and unlike shirts
neckties trousers
we cannot wear it out

no sir which is why
granted who discovered
America ether the movies
may claim general importance

to me you nothing is
what particularly
matters hence in a

little sunlight and less
moonlight ourselves against the worms
hate laugh shimmy.

এই হল কবি কামিংস্-এর উক্তি।

এলিয়ট-এর 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর কোনো অংশকেই বাকচাল এমন কি মহনীয় চাতুর্য বললেও অন্যায় করা হবে হয়তো, কিন্তু কামিংস্ ইত্যাদি অনেকের কবিতা অবান্তর চাতুরী ছাড়া আর কিছুই নয়। অডেন, স্পেণ্ডর, ম্যাকনিস প্রভৃতি কবির অনেক লেখাও এই ধরনের। এজরা পাউণ্ড-এর রচনাগুলো বাস্তবিকই কবিতা—তাঁর আধুনিককান্টোজ-মহাকাব্যের অর্থ ও

ইঙ্গিত বুঝবার ক্ষমতা আমাদের তো দূরের কথা, স্বয়ং ইয়েট্‌স-এর কপালেও ঘটে ওঠেনি;এলিয়টও কি বুঝেছেন?

এ থেকে বুঝতে হবে না যে আধুনিক ইংরেজি বা বাংলা কাব্য রীতিমতো নৈরাজ্যে প্রবেশ করেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের থেকে সচেতনভাবে মুক্তির জন্যে যে বিপ্লব চলেছিল কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে বাংলা কবিতায়—তা এখন এক দল জ্যেষ্ঠ কবিদের ভিতরে অবচেতন লোকে বিদ্রোহের মূর্তি ধরেছে, রবিকাব্যলোকের বিপক্ষে ঠিক নয়, কিন্তু রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাবের বিরুদ্ধে। এটাকে বিদ্রোহও ঠিক বলা চলে না, কেননা সময় নিজেই কবিসার্বভৌমকে এমন একটা দৈগন্তিক মহত্ত্বের ভিতর সরিয়ে নিয়ে গেছে যে তাঁর সম্পর্কে বিদ্রোহের প্রশ্ন এখন অনেকটা অপ্রাসঙ্গকি বলে মনে হয়।

আর এক দল বয়স্ক ও অল্পবয়সী কবিদের লেখার ভিতর বাচন-স্মরণীয়তা খুব বেশি বহুল হয়ে উঠে স্মরণীয় গুণ আড়ষ্ট করে ফেলছে—রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কাব্যকে মননে রেখে নয়, ভুলে গিয়ে; বরং, নিজেদের কবিতার প্রয়োজনে সেই পূর্বজ কবিসত্তাকে স্বাভাবিক ভাবেই অহেতুক জিনিস মনে করে। রবীন্দ্রনাথকে ভুলতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বেগ পেতে হয়েছিল—তাঁর ছন্দের সমস্ত সঙ্গতের পিছনে রয়েছে সেই বিরাট সমসাময়িক কবিপ্রতিভাসেতুকে এড়িয়ে যাবার জন্যে আঙ্গিকের অসংখ্য কৌশল নিয়ে বিলাস ও ব্যসনের সদিচ্ছা। রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে আসতে নজরুলকে বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেকেই যেন স্পর্শ বাঁচিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—আধুনিক, আরো আধুনিক, জ্যেষ্ঠ কবিদের বিলায় কিম্বা সমর, সুভাষ প্রভৃতি অনুজ কবিদের ভিড়ের ভিতর থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে বাংলা কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরিমণ্ডল ফেলে সরে চলে যাচ্ছেন এই জন্যে যে তিনি সময়তীর্ণ প্রতিভা হলেও উত্তররৈবিক সময়ের সমস্ত মোটা আনুষঙ্গিক কলার সঙ্গে তাল রেখে নয়—কিন্তু সে সবকে প্রজ্ঞা দিয়ে অনুভব করে—কবি। তিনি তাই আজকের এই উনিশশো ছেচল্লিশ সালের জানুয়ারী মাসের বা উনিশশো পঁয়তাল্লিশের

অক্টোবরের রাজনীতি ও অর্থনীতির হারজিতের পাঁয়তারার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে কবি নন; কিন্তু এই রকম বহির্মুখী চৈতন্যরাশি উপলব্ধি করে তবুও তিনি তাঁর কবিতাকে সাময়িকতার সংস্কারমুক্ত করে যে সময়ব্রহ্মের শুদ্ধ-স্বরূপের ভিতর নিয়ে গেছেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করবার ভার আমাদের উপর ততটা নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, সে ভার মহাকালের উপর। আধুনিক অনেক কবির কবিতা—যা উক্তির স্মরণীয়তার জন্যে বিখ্যাত তা—কিন্তু মহাকালের উৎসঙ্গে লুটিয়ে নেই তা বিশেষ করে আজকের জন্যেই—এমন প্রগাঢ়ভাবে আজকের জন্যে যে, সমসাময়িক কালকে যদি অতীত ও আনন্ত্যের থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন করে ঈষৎ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি তাহলে সেই সময়ের জন্যে অন্তত দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করতে হবে যে আধুনিক যুগের আবশ্যিক বাঙালী-কবি এঁরাই, রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর ঐতিহ্যপথিক শিষ্যেরা নন! কিন্তু আধুনিক বা আগামী দশকের আবশ্যিকতার কাব্যে আজকের সব কবিদেরই পরিণতি শেষ হয়ে যাবে বলে মনে হয় না। এঁদের কেউ-কেউ অন্তত আরো দীর্ঘতর সময়ানুভূতির ভিতরে কবিতা সৃষ্টি করবার মুখপাত্র হিসেবে বর্তমান আছেন—আধুনিক কাল ও সমাজ সম্পর্কে জাগ্রত চেতনা বজায় রেখে।

এখনকার জীবিত উল্লেখযোগ্য বাঙালী কবিদের কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়। আধুনিক ইংরেজি কবিতায়ও কয়েকটা বিশেষ আন্দোলন রয়ে গেছে, যেমন—ট্রাডিশনালিজম্, জর্জিয়ানিজম্, ইমেজিসম্, ওয়র পোয়েট্রি, পোয়েট্রি অব আইরিশ রেনেসাঁস, পোয়েট্রি অব রিভোল্ট্ ইত্যাদি। এর ভিতর আইরিশ রেনেসাঁস-এর ইয়েটস, ট্রাডিশনালিজম্-এর হার্ডি ও হাউসম্যান এবং রিভোল্ট-এর সিট্ওয়েল প্রমুখ কবিরা, ও এলিয়ট এবং আধুনিকতর ডেলুইস, স্পেণ্ডর, অডেন শীর্ষক কবি-নটেশের দল খুবই বিশ্রুত!

আধুনিক বাংলা কাব্যে বেশ সুবলয়িত কয়েকটি ধারা আছে। সে সবের কথা আর একদিন বলা যাবে। দু-চারটে বিশেষ নাম—কাব্যধারার কথা এখন বলছি না—চোখে পড়ে। অমিয় চক্রবর্তী রয়েছেন, যিনি আঙ্গিকের একটা বিচিত্র আবহ—একটানা বলব?—তারি ভিতর দিয়ে জীবনের অনুধ্যান

ফুটিয়ে চলেছেন। কবিতা তাঁর সরলবক্রচালের জিনিস, অস্বাভাবিকতার যতটা ভ্রান্তি উজিয়ে তোলে মনের ভিতর তার চেয়ে তা সহজ ও স্বাভাবিক। আমার মনে হয় আঙ্গিকের ইশারা তিনি পেয়েছেন হপ্‌কিন্‌স-এর কাছে।

বুদ্ধদেবের কবিতার বহিঃপ্রসাধন স্তিমিত করেছে কি তার ভিতরের বহ্নি?—না সত্য এর বিপরীত? তিনি কোনোক্রমেই 'অসাহিত্যিক' নন বলে, কবিতা না হোক, সমালোচনা তাঁর—এমন কি দর্শনভীরু—তবুও তাঁর কাব্যে জীবনদর্শন রয়ে গেছে। তিনি আশা ভরসা বিশ্বাসী—অমিয়বাবুর মতো—স্মরণাতীত কোনো বৈকুণ্ঠে বা ব্রাহ্মলোকে নয় হয়তো, কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকা—এই মানুষ ও প্রকৃতির নিরন্তর পুরোনো উৎকর্ষ-পরিবর্তনের পথে অক্ষম বিজ্ঞানকে শুদ্ধ তর শক্তির উৎস হতে দেখে—আরো শুভ্র হবে বিশ্বাস করে—শিল্পপ্রকরণ দিয়ে যতদূর সম্ভব হয় সহায়ক হিসেবে সেই উন্নতির পথে থাকতে অস্বীকৃত না হয়েও—প্রাক্তন স্বপ্নে সাক্ষরিত হয়ে থাকতে ভালোবাসেন।

সুধীন্দ্রনাথ আজকাল কবিতা লেখা একদম ছেড়ে দিয়েছেন। এই কবির প্রতিভা এবং আন্তরিকতা এঁর নিজের জিনিস। আর কিছু জানাবার নেই মেনে হয়তো তিনি আত্মজিজ্ঞাসায় চুপ হয়ে আছেন। এ রকম আত্মপ্রসাদহীন সংযম দেশী-বিদেশী খুব কম লেখকের বেলাই দেখা যায়। তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যের সব চেয়ে বেশি নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা। 'উত্তরফাল্গুনী' প্রভৃতির কাব্যশরীরের নূতনত্ব তাদের আত্মার ভিতরে। এ সব কবিতা হঠাৎ পড়লে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে অন্তর্যামী শিষ্যের লেখা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে জোর করে এড়িয়ে যাবার কোনো তাগিদ নেই সুধীন্দ্রনাথের; তাঁর কবিতা এত সহজভাবে বাংলা কবিতার ঐতিহ্যপথে চলেছে যে, খুব স্বাভাবিকভাবেই তা কবিসার্বভৌমের পরিধি অতিক্রম করে সুধীন্দ্রীয় কাব্য—নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। নিজের কবিতার পরিপ্রেক্ষিতের পরিসর তাঁর হোমর ও দ্বৈপায়নের পরিসরকে অনুভূতির আয়ত্তের ভিতরে এনে এক শেষ সনাতনের আভাস দিয়ে গেছে হয়তো বা এক সুধানবীনতার দিকবধূকে। কিন্তু এইখানে তাঁর আত্মসমালোচনা তাঁকে নবসূর্যনীলিমাক্রান্তির থেকে মুখ

ঢেকে রেখেছে—ভেবে দেখলে এও এক আশাপ্রতীতির প্রস্থানলোক;অবিশ্বাস এখানে কপটতা করে পথভ্রষ্ট হয়নি, নিজেকে বিশ্বাস করেছে। আধুনিক সাহিত্যের প্রায় বারো আনা তথাকথিত প্রাগ্রসর কবিতার চেয়ে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা বেশি প্রবীণ;তাঁর নিজের এষণার কবিতালোকে তিনি আধুনিক প্রায় সকল কবির চেয়েই বেশি আন্তরিক নন কি?

প্রেমেন্দ্র বাংলাকাব্যের ঐতিহ্য নামঞ্জুর করেননি;অনেক বিচিত্র চক্রবাল থেকে কিরণ এসে সেখানে মিলেছে যদিও। সুধীন্দ্রনাথের মতন নিরাশার কেন্দ্রে তিনি অতটা আত্মস্থ নন। সুধীন্দ্রনাথ তটভূমি খুঁজে পেয়েছেন—প্রেমেন্দ্র সমুদ্রপ্রেমিক নাবিকের মতো—অতিবেল তরঙ্গের উপর দিয়ে ভূগোল ও মানুষের ইতিহাস ও অতিপৃথিবীর আকাশ চিনে, আধো চিনে, রৌদ্রপটবেলাভূমি সহসা লক্ষ্য করে আবার হারিয়ে ফেলে—এ জীবনকে সময়ের কাছে ঋণী রেখে, নিরন্তর সময় কাটিয়ে চলেছেন। কিন্তু এ ঋণাত্মক সময়-ব্যবহার-কি অগ্রসর, না গোলকধাঁধায় ঘোরা না শঙ্খারেখার ঘুরুনিতে ছন্নাংশ উন্নতির লোভে আবিষ্ট হয়ে তকে শুভ পরিণামের যাত্রা বলে মনে করা—প্রেমেনের কবিতা শেষ পর্যন্ত এ সবের কোনো সম্যক পরিচয় দিচ্ছে না। তাঁর শেষের দিকের কবিতা তাঁর আগেকার কবিতার চেয়ে পরিণতি লাভ করে প্রবীণ হয়ে উঠেছে বলে মনে হয় না। প্রেমেনের কবিতায় নবীনতার আস্বাদ বেশি—তাঁর শিল্পপ্রেরণা ও জীবনচেতনা দুটোকে একই বিচিত্র জিনিস বলে তাই মনে হয়; প্রায়ই বিচিত্র, কোনো কোনো সময়ে মহৎ; কিন্তু তিনি অকূলপাথার দেখেছেন মোহে বা নির্মলরৌদ্রে আচ্ছন্ন করে এতই বিমুগ্ধভাবে যে, সুধীন্দ্রনাথের মতো তীরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবনপাঠ আজকের দু-এক দশকের মানসকে যেন বেশি আকর্ষণ করতে চায়, প্রেমেন ও নজরুলের কাব্যাত্মা বিগত দু-এক দশককে যেমন বেশি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু দশকের সীমা ভেঙে পড়ছে, আধুনিক বাংলা কাব্যের উপর প্রভাব এসে পড়েছে নানা দিক থেকে। কেউ অতীত থেকেই রয়ে গেছে, এখন প্রবীন; কেউ এসেই প্রবীণ হয়ে পড়েছে, না হলে চলে না;সবাই প্রবীণ বলছে বলেই কেউ-কেউ প্রবীণ; কেউ উপেক্ষিত—মহাকাল হয়তো তাকে প্রবীণ বলবে।

যেন সাহিত্যের চরম মান—'স্ট্যাণ্ডার্ড'—হচ্ছে প্রবীণতা। কিন্তু জীবনের প্রবীণতা সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে যে ভাবপ্রতিভা ও প্রজ্ঞা বহির্মুখী চেতনারাশির উপর কাজ করে মহৎ কবিতার জন্ম দেবে—সে সব রীতি ও শক্তির অভাবই চোখে পড়ে বেশি।

উত্তররৈবিক যুগ 'কল্লোলে'র সময় থেকে আরম্ভ হয়েছিল। সেই সময়কার প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য কবিই আজ জীবিত, এবং আরও দু-তিন দশক অন্তত সক্রিয় ভাবে কাব্য সৃষ্টি করবেন এ-রকম মনোভাব থেকে এঁদের অনেকেই নিঃসক্ত নন। তা সম্ভব হলে এ-যুগ বাংলাকাব্যের ইতিহাসে কয়েকটি ধারা সমাবেশের যুগ বলে—সাহিত্যে অনুত্তরণ নামে যে এক দীর্ঘ নদী আছে তার এক মহৎ অববাহিকার মতো ছড়িয়ে থাকবে—যেখানে কোনো একজন রবীন্দ্রনাথ নেই, কিন্তু এমন কয়েকজন কবি আছেন যাঁরা সকলে মিলে একসঙ্গে উপস্থিত আছেন বলে কোনো দ্বিতীয় একক রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন নেই। এ যুগ অনেক লেখকের—একজনের নয়—কয়েকজন কবির যুগ। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের একচ্ছত্র প্রভাব অনেকদিন পর্যন্ত অনুভব করার পর এই নতুন কবিসাধারণসংঘ সাহিত্যের কাছে সময়ের দান। আজকের বাংলা কবিতার দু-এক অধ্যায় অন্তত শেষ হওয়ার ফলে তা আলোড়নের ম্লানিমা কাটিয়ে ক্রমেই পরিচ্ছন্নভাবেই কেলাসিত হয়ে উঠছে। উত্তররৈবিক কাব্য অভিজ্ঞতায় বাঙালীর মন সমাজ-জীবনে কিছু নির্দেশ পাবে হয়তো; জীবনের প্রয়োজেনে আরো বেশি পাবে বলে মনে হয়।

১৩৫২

কবিতা প্রসঙ্গে

কবিতা রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারা যায় এই : যখনই 'ভারাক্রান্ত হই, সমস্ত ভাবটা বিভিন্ন আঙ্গিকের পোশাকে ততটা ভেবে নিতে পারি না, যতটা অনুভব করি—একই এবং বিভিন্ন সময়ে। অন্তঃপ্রেরণা আমি স্বীকার করি। কবিতা লিখতে হলে ইমাজিনেশনের দরকার; এর অনুশীলনের। এই ইমাজিনেশন শব্দটির বাংলা কি? কেউ হয়তো বলবেন কল্পনা কিংবা কবিকল্পনা অথবা ভাবনা। আমার মনে হয় ইমাজিনেশন মানে কল্পনাপ্রতিভা বা ভাবপ্রতিভা। বুদ্ধি—ধী—সকলেরই আছে এ কথা বলা চলে না। কল্পনা সব মানুষের মনেই সমান বিস্তার ও নিবিড়তা পেয়েছে বা পেতে পারে—এ কথা মনে করা ঠিক নয়। উৎকর্ষের তারতম্য আছে। কল্পনার (ও অন্যান্য মনোদৃষ্টির) সাহায্যে সাহিত্যসৃষ্টি হয়, কিংবা নবীন রাষ্ট্র, অর্থনীতি, বিজ্ঞান। কিন্তু এ সব বিভিন্ন ক্ষেত্রে কল্পনা একই ভাবে কাজ করে না, তার অন্তঃসারও একই রকমের নয়। যে কবির কল্পনাপ্রতিভা আছে সে ছাড়া আর কেউ কাব্যসৃষ্টি করবার মতো অন্তঃপ্রেরণার দাবি করতে পারে কি? এ প্রেরণা ছাড়া শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখা কি করে সম্ভব হতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরের মর্যাদায় টের পাওয়া যাবে আলোচনার বিচারসহনশীলতা।

কিন্তু ভাবপ্রতিভাজাত এই অন্তঃপ্রেরণাও সব নয়। তাকে সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ তর্কের ইঙ্গিত শুনতে হবে, এ জিনিস ইতিহাসচেতনায় সুগঠিত হওয়া চাই। এই সব কারণেই—আমার পক্ষে অন্তত— ভালো কবিতা লেখা অল্প কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার নয়;কবিতাটিকে প্রকৃতিস্থ করে তুলতে সময় লাগে। কোনো-কোনো সময় কাঠামোটি, এমন কি সম্পূর্ণ কবিতাটিও, খুব তাড়াতাড়ি সৃষ্টিলোকী হয়ে ওঠে প্রায়। কিন্তু তারপর—প্রথম লিখবার সময়

যেমন ছিল তার চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে—চারদিককার প্রতিবেশচেতনা নিয়ে শুদ্ধ প্রতর্কের আবির্ভাবে, কবিতাটি আরও সত্য হয়ে উঠতে চায় : পুনরায় ভাবপ্রতিভার আশ্রয়ে। এ রকম অঙ্গাঙ্গিযোগে কবিতাটি পরিণতি লাভ করে। এর ফলে, আমার এক বন্ধু লিখেছেন : 'কবিতার প্রত্যেকটি আঙ্গিক অন্য প্রত্যেকটি আঙ্গিককে স্পষ্ট ও সুসমঞ্জস করে তোলে। এতে করে কোনো একটি বিশেষ ছত্রের দাম হয়তো ক্ষুণ্ন হয়, কিন্তু সমস্ত নক্সাটার উজ্জ্বলতা চোখে পড়ে বেশি।' কিন্তু এরকম ঐকান্তিক কবিতা আমি বেশি লিখতে পারিনি। এর কারণ, ভাবপ্রতিভা তাকে বলয়িত করে নেবার অবসর ও শক্তি, এবং প্রজ্ঞাদৃষ্টির উপযুক্ত প্রভাব কোনো-না- কোনো কারণে কিছু শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো; কবিতা লিখবার পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি। এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই আমার কাছে। তবে সময়চেতনার নতুন মূল্য আবিষ্কৃত হতে পারে।

আজ পর্যন্ত যে সব কবিতা আমি লিখেছি সেসবে আবহমান মানবসমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের শোভাভূমিকায় এক 'অনাদি' তৃতীয় বিশেষত্ব হিসাবে স্বীকার করে, কেবল মাত্র তারি ভিতর থেকে উৎসনিরুক্তি খুঁজে পায়নি। নাট্যকবির পক্ষে এটা পাওয়া প্রয়োজন। প্রতিভাসিক কবিতাজগতের একাগ্রতা ভেঙে ফেলে তাকে নাট্যপ্রাণ বিশুদ্ধতা দেয় সেই কবি। কিন্তু তবুও তিন জগতেই বিচরণ করে সে—মানবসমাজকেই চিনে নেবার ও চিনিয়ে দেবার মুখ্যতম প্রয়োজনে আন্তরিক হয়ে ওঠে। লিরিক কবিও ত্রিভুবনচারী, কিন্তু তার বেলায় প্রকৃতি, সমাজ, ও সময় অনুধ্যান কেউ কাউকে প্রায় নির্বিশেষে ছাড়িয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে না; অন্তত মানবসমাজের ঘনঘটায় প্রকৃতি ও সময়ভাবনা দূর দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে মিলিয়ে যাবার মতো নয়। কাজেই উপন্যাস ও নাটকের মতো মানুষমনকে সমূলে আক্রান্ত না করেও, কবিতা মানসের আমূল বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতে পারে—

তাকে নির্মলতর করে তুলবার জন্য—কথা ও ইঙ্গিতের দুর্লভ স্বল্পতার ভিতর দিয়ে।

কোনো কিছুকে 'চরম' মনে করে সুস্থিরতা লাভ করবার চেষ্টায় আত্মতৃপ্তি নেই; রয়েছে বিশুদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করবার প্রয়াস—যাকে কবিজগৎ বলা যেতে পারে—নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভিতর বাস্তবকে যা ফলিয়ে দেখাতে চায়। এতে করে বাস্তব বাস্তবই থেকে যায় না; দুয়ের একটা সমন্বয়ে সেতুলোক তৈরি হয়ে চলতে থাকে এক থেকে অপর যুগে—কোনো পরিনির্বাণের দিকে, কারু মতে; অল্পাধিক শুভ পরিচ্ছন্ন সমাজপ্রয়াণের দিকে, অন্য কারু ধারণায়; কবিজগতে যে পাঠকেরা ভ্রমণ করেছেন তাঁদের দিকে, মনে (কিংবা হাতে) ইহজগৎ আবার নতুন করে পরিকল্পিত হবার সুযোগ পায় তাই।

আমিও সাময়িকভাবে কোনো-কোনো জিনিসকে 'চরম' মনে করে নিয়েছি জীবনের ও সহিত্যের তাগিদে, মনকে চোখঠার দিয়ে মাঝে-মাঝে —টেম্পররি সস্‌পেনশন্ অব ডিজ্‌বিলিফ হিসেবে। কিংবা কখনো-কখনো মনকে এই বলে বুঝিয়েছি যে, যাকে আমি শেষ সত্য বলে মনে করতে পারছি না, তা তবুও আমাদের আধুনিক ইতিহাসের দিক-নির্ণয়-সত্তা; আজকের প্রয়োজনে চরম ছাড়া হয়তো আর কিছু নয়। কিন্তু তবুও সময়-প্রসূতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা লাভ করতে চেষ্টা করেছি। অনেকদিন ধরেই পরিপ্রেক্ষিতের আবছায়া এত কঠিন যে, এর চেয়ে বেশি কিছু আয়ত্ত করা আধুনিকদের পক্ষে অসম্ভব না হলেও কিছুটা সুদূরপরাহত।

১৩৫৩

কবিতার আত্মা ও শরীর

আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা 'প্রেরণা' শব্দটির দিকে আড়চোখে তাকাই। শব্দটির ঢের অপব্যবহার হয়েছে। কিন্তু তবুও এর নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটির শুদ্ধতা ও সঙ্গতি নষ্ট হবার নয়। নিছক বুদ্ধির জোরে কবিতা লেখা সম্ভব নয়—আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন—এবং সে সবের সম্মিলিত সম্বন্ধ-শৃঙ্খলের থেকেই প্রেরণার জন্ম হয়। এ প্রেরণা অবিশ্যি মহাত্মা গান্ধী কিংবা লিঙ্কনের মতন রাষ্ট্রকর্মীর প্রেরণার চেয়ে পৃথক জিনিস—কবিমানসের আবেগ ও প্রজ্ঞার মিলন ঘটিয়ে মানুষের আবহমান অভিজ্ঞতাকে আরো ঠিক ভাবে বুঝবার সুযোগ দেয় এই প্রেরণা। প্রেরণার উৎস অবশ্য নানা দিক দিয়ে নানা ধারায় এসে উপস্থিত হয়। আমরা আজ যে তুমুল, জটিল পৃথিবীতে বাস করছি, এখানে নিজেকে সুস্থির করে নিয়ে কবিতা বা অন্য কোনো শিল্প সৃষ্টি করবার সময় কবির মনে বিশেষ অনুভূতির ও আবেগের জন্ম এত বিভিন্ন ও বিচিত্র জিনিস ও ঘটনা-সংস্থানের থেকে উৎপন্ন হতে পারে যে, নিছক বৈজ্ঞানিক ও টাকাকড়ির অকৃত্রিম, অন্তিম বিকলনের ও প্রভাবের যুগের কাব্যের উৎস ফুরিয়ে যাবে বলে সেকালের মনীষীরা যে আশঙ্কা করতেন তা নিতান্তই ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়। বিজ্ঞানের প্রকর্ষের দিনে আজকের কবি বিজ্ঞানের সত্যকে অস্বীকার করে কবিতা সৃষ্টি করবার কোনো আবেদন অনুভব করছেন না;—কবি যদি প্রকৃতিকে ভালোবাসেন তিনি, কিংবা জীবনের পরে মৃত্যুর রহস্যলোককে, যদি তিনি অতীত বা আধুনিক মানুষ সমাজের অভাব ও অবিচার যে অবিজ্ঞানী অবিদ্যার থেকে সঞ্চিত একথা উপলব্ধি করে বিমর্ষতা বোধ করেন, কিংবা এ অভাব ঘোচাবার জন্যে আগামী দিনের সৎ সমাজের প্রবর্তনায় নিজের প্রজ্ঞা-দৃষ্টিকে নিয়োজিত

করে আশা-ভরসার কবিতায় উৎসারিত হয়ে উঠতে চান—সবই তিনি পারেন—বিজ্ঞান কোথাও তাঁকে বাধা দেবে না। কারণ উপরোক্ত সাধ ও সঙ্কল্পগুলো আজকের অনুমোদিত দৃষ্টিসততার বিরুদ্ধে চালিত হয়ে বিতর্কলোকের কোনো হাস্যকর অসঙ্গতির জ্ঞাপন তো নয়। মানুষের জীবনে ও সৃষ্টির ভিতরে সত্য কী—আমরা যাকে সত্য বলে বুঝে নিয়েছি সেইটেই প্রমাণিক জিনিস কিনা, না আমাদের মানুষী বিচার ও অনুভূতির ভুল এ নিয়ে দার্শনিকেরা শেষ দিন পর্যন্ত আলোচনা করবেন;—কিন্তু তবুও আজকের দিনে জীবনের যে সুসঙ্গতি ও সুচ্ছন্দ তাল ও মানকে আমরা আধুনিক যুগের উপযোগী কবিতার সত্য বলে জেনেও এদের সম্পর্কে বিজ্ঞানের ভ্রূকুটির কোনো নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি না—এই সব প্রচলিত সত্য নব যুগের মতন লৌকিক বুদ্ধি ও মনীষীদের অভিচেতন মূল্যানুসন্ধানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যে নবীন তনুলোক নিয়ে বিচরণ করে সেই তন্বীদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত না হতে পারলে আধুনিক কালে সৎ কবিতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না।

মানুষের আবহমান পৃথিবীর শীর্ষে এই নতুন পৃথিবী—এবং মানুষের অনেকদিনের চেনা সত্যমিথ্যার কুয়াশা ভেদ করে আজকের নতুন মিথ্যা ও সত্যের শরীরে অঙ্কিত বিজ্ঞানের স্বাক্ষর—এই সব নিয়েই আজকের কবির সৃষ্টিবলয়। অতএব আধুনিক কবির মানসলোকের গঠনে পূর্বজ কবিমন কিছু সংহত হয়েছে, নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, কবিচিত্তের স্বাধীনতা নতুন মূল্যবিচারকে এড়িয়ে উড়তে ইতস্ততবোধ করছে। যে কবিমন তা বোধ করে না তা ক্রমেই সুপরিসর হতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত অন্তহীন গোলকধাঁধার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়; কিন্তু এরকম নিরাশ্রয়ের ভিতরে আধুনিক মহৎ কবিমানস সজ্ঞানে প্রবেশ করে না। আগেকার কবিদের চেয়ে আধুনিকের এই মননলোক মহত্তর কিনা, হোমরের চেয়ে আধুনিক ইউরোপীয় কবিপরিমণ্ডল, মাঘভারবির চেয়ে আজকের বাঙালী বা বিদেশী কবিরা বড় কিনা, এ প্রশ্ন অপ্রসঙ্গিক; কারণ কোনো বিশেষ যুগে জন্মেছে বলে কবি বড় বা ছোটো হয় না, যুগের উপযুক্ত বিচিত্র মানসসত্তার অধিকারী

হয়—এই মাত্র। আমাদের যুগে আমরা কতকগুলো পুরোনো সত্যকে নতুন করে গ্রহণ করেছি এবং উদ্বোধিত করেছি সমাজের ও বস্তুবিশ্বের কতকগুলো নতুন সত্য; এগুলো আজ পর্যন্ত নতুন সত্য, আগামী কাল এদের সম্বন্ধে কি ভাববে জানা নেই। কোয়ান্টাম থিওরি, সময়-দেশের আপেক্ষিকতা, দেশকালের সীমা প্রসৃতি, বিচূর্ণ পরমাণুর আশ্চর্য উত্তেজ, ধনতান্ত্রিক সুনিয়ম ও সুকৃতির উপর সৎসমাজের প্রতিষ্ঠা এই বৈজ্ঞানিক প্রবর্তনার পক্ষেই মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা—কোনো আদর্শ আবেগের পথে নয়; আমাদের পরবর্তী যুগ এসে এসব সত্যকে খতিয়ে দেখবে আর একবার। আমরাও দেখেছি—এবং এই আশ্চর্য চলৎপ্রতিভাময়ী পটভূমির সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছে আধুনিক কবিমন; সেই মনের থেকে উত্তীর্ণ ছন্দের দ্যোতনায় সৃষ্ট হয় যা তা-ই কবিতা। যে কোনো সময়ের যে কোনো জগতের সত্য অভিজ্ঞতা কোনো এক বিশেষ আধারে অন্তঃপ্রবেশ লাভ করে যখন চিত্রস্তনিত ধবনির পবিত্র মর্মস্পর্শিতায় ফুটে উঠতে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে, সে আধার সক্রিয় কবিমন—কবিতা সৃষ্টি হচ্ছে।

কাব্যের ছন্দ তো অনেকরকম; গদ্যও তো এক রকম ছন্দ। কবি যখন ভাবাক্রান্ত হন তখন চোখ তাঁর ছবি দেখে, কান শোনে ছন্দ এবং চোখও অনুভব করে যেন ছন্দবিদ্যুৎ; কোন ছন্দে কবিতাটি রচিত হবে মুহূর্তের ভিতরেই নির্ণীত হয়ে যায় অনেক সময়; কারণ যে কোনো আবেগ যে কোনো ছন্দে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না, কবিপ্রেরণায় তারতম্য অনুসারে ছন্দের জাতিনির্ণয় হয়।

একজন আধুনিক বাঙালী কবি লিখেছেন :

বৈদেহী বিচিত্রা আজি সঙ্কুচিত শিশিরসন্ধ্যায়
প্রচারিল আচম্বিতে অধরায় অহেতু আকুতি :
অস্তগামী সবিতার মেঘমুক্ত মাঙ্গলিক দ্যুতি
অনিত্যের দায় ভাগ রেখে গেল রজনীগন্ধায়।।

ধূমায়িত রিক্ত মাঠ, গিরিতট হেমন্তলোহিত,
তরুণতরুণীশূন্য বনবীথি চ্যুত পত্রে ঢাকা,
শৈবলিত স্তব্ধ হ্রদ, নিশাক্রান্ত বিষণ্ণ বলাকা
ম্লান চেতনারে মোর অকস্মাৎ করেছে মোহিত।।

নীরব, নশ্বর যারা, অবজ্ঞেয়, অকিঞ্চন যত,
রুচির মায়ায় যেন বিকশিত তাদের মহিমা;
আমার সঙ্কীর্ণ আত্মা, লঙ্ঘি আজ দর্শনের সীমা,
ছুটেছে দক্ষিণাপথে যাযাবর বিহঙ্গের মতো।।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি অনন্যসাধারণ কবিতা কিছু নয়। কোনো নতুন সুর ফোটেনি ওখানে। স্তবক তিনটি বাংলা কবিতাছন্দের ঐতিহ্যর বড় মূল সুর টেনে চলেছে। কিন্তু সেই বড় সুর যে পয়ারে ব্যক্ত হয়েছে, পয়ার ছন্দ যে বাংলা কবিতার প্রাণ ও আত্মা (আজ পর্যন্ত), অন্য কোনো ছন্দ যে পয়ারের এই শীর্ষদেশী মাহাত্ম্য ও গহনতার স্থান নিতে পারে না, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ প্রধান কবিদের রচনায় তা স্বতঃপ্রমাণিত হয়ে রয়েছে—উপরের বারোটি লাইনেও।

আধুনিক বাংলা কবিতায় পয়ার প্রায় সর্বব্যাপী। আমার তো মনে হয় আজকের শ্রেষ্ঠতর বাঙালী কবিরা পয়ারকে স্বচ্ছন্দে এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যত বেশি গ্রহণ করেছেন, এমন আর কোনো ছন্দকে নয়। পয়ার সম্বন্ধে একজন আধুনিক কবি সমালোচক লিখেছেন :

" 'পয়ার' শব্দটির ব্যবহারও রবীন্দ্রনাথে এক-এক সময় এক-এক রকম। অধিকাংশ সময় তিনি চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী পয়ার বলতে ত্রিপদীর মতো একটা ছন্দোবন্ধ বুঝেছেন...তার মানে চোদ্দ মাত্রা হলেই যে পয়ার হবে তা নয়, কিন্তু পয়ারে চোদ্দ মাত্রা থাকতেই হবে। অবশ্য আঠারো মাত্রার 'বড়ো পয়ার'ও স্বীকার করেছেন তিনি, কিন্তু 'আধুনিক বাংলা ছন্দ সব চেয়ে দীর্ঘ পয়ার আঠারো অক্ষরে গাঁথা', এ-কথা তিনি কেন লিখেছিলেন জানি না, কেননা তাঁর নিজের রচনাতেই আঠারোর

চেয়েও বড়ো মাপের পংক্তি পাওয়া যায়...আধুনিকতর কবিরা ২২ ও ২৬ মাত্রা অক্লেশে চালিয়েছেন। এখানে আপত্তি উঠতে পারে যে ২২ ও ২৬ মাত্রার পয়ার আসলে সেকেলে লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদীর একেলে রকমফের মাত্র, আর এ আপত্তি একেবারে উড়িয়ে দেবার মতোও নয়। তবু তফাত একটু আছে। সে-তফাত এইখানে যে ত্রিপদীতে যতিস্থাপনের যে-নিয়ম নির্দিষ্ট ছিলো, আধুনিক কবিরা তা লঙঘন করে তাঁদের লম্বা মাপের পয়ারে যতি-স্থাপনের বৈচিত্র্য এনেছেন। সেই জন্য এই লম্বা পয়ারকে ছদ্মবেশী ত্রিপদী মনে করাও ঠিক হবে না। পাঠককে হয়তো বলে দেয়া দরকার যে, পয়ার বলতে আমি একটা ছন্দ বুঝি, আর ত্রিপদী বলতে পয়ারের একটা ছন্দোবন্ধ।" আধুনিক বাংলা কবিতার একটা বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে ২২ ও ২৬ এবং ক্বচিৎ তার চেয়েও দীর্ঘতর মাত্রার পয়ারের পংক্তি নিয়ে উপস্থিত হওয়া।

এখনকার বাংলা কবিতায় যতিপ্রান্তিক ছন্দের উৎকৃষ্ট নিদর্শন আছে কিনা সন্দেহ। আধুনিক বাঙালী কবিদের ভিতর পোপ-এর ভূত কারো-কারো ঘাড়ে না চড়লেও ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যমণ্ডল আলেকজাণ্ডার পোপকে প্রায় গুরুস্থানীয় বলে মনে করেন, এমন কবির অভাব নেই। কিন্তু যদিও বা আধুনিক ইংরেজি কবিতায় মাঝে-মাঝে পোপ- এর মতো যতিপ্রান্তিক ছন্দে রচিত দীর্ঘ কবিতার সন্ধান মেলে, তবুও আজকালকার বাংলা কাব্যে ঈশ্বর গুপ্তের পদ্যে কিংবা পোপ-এর কবিতায় আন্তরিক উৎসাহী কোনো কোনো কবিকে যতিপ্রান্তিকতার আড়ষ্টতায় ধরা পড়তে দেখা যায় না; কবিতার মর্মবাণী ফোটাতে গিয়ে বিশেষ সংহতির পরিচয় দিলেও আঙ্গিকের দিক দিয়ে তাঁর ছন্দের প্রবহমানতাকেই ঢের বেশি পছন্দ করেন—মুক্তক পয়ার মুক্তক স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত মুক্তকেও লেখেন। একজন আধুনিক কবি তাঁর নিজের কবিতার থেকে মুক্তক স্বরবৃত্ত ছন্দের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

অন্ধকারের অন্তর থেকে তরঙ্গ-রোল ইতস্তত

কেঁপে ফুটে ওঠে, ফেটে বেজে যায়; ঢেউয়ের মুখের
ফেনার মতো...
গড়ায়, ছড়ায় সুপ্তির 'পরে স্বপ্নের ঘোরে সমস্ত রাত :
তেমনি তোমার নামের শব্দ, নামের শব্দ আমার কানে
বাজে দিন-রাত, বাজে সারা রাত, বাজে সারা দিন
আমার প্রাণে...
আমি চেয়ে থাকি, দেখি চোখ ভরে : মনে হয় মোর
আঁকাবাঁকা জলে, মেঘের রেখায়
একা বাঁকা চাঁদ চুপ-চুপ করে কথা কয়ে যায়...
এলোমেলো জলে আলো ওঠে জ্বলে, ছলছল ঢেউ
তোমার নামে
তীরে চুমো খায়, দূরে নিয়ে যায় ঢেউয়ের জলের
স্রোতের টানে...

মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের উদাহরণ বাংলা কবিতায় বেশি নেই;—এই যুগের অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করবার জন্যে সর্বব্যাপী নিপীড়নের যে পরিচয় পাওয়া যায় রাষ্ট্রে ও সমাজে—সেইটে কাব্যের ছন্দালোকে নিঃসংশয়রূপে প্রতিফলিত হলে মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের জন্ম হয় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। যদি হয় এবং কবিতার ছন্দ যদি যুগের নাড়ী-মূলের নির্দেশ দান করে, তাহলে এ রকম মুক্তকে প্রচুর কবিতা আশা করা যায়। কিন্তু কোথায় তা?

আধুনিক কালের প্রাণের কথা এক দিক দিয়ে যেমন সংহতি সন্ধান করছে, অন্য দিক দিয়ে যেমনি তথাকথিত আপেক্ষিক কালের প্রতীকের মতো সমাজ ও জীবনের আধুনিক বন্দিদশার সীমা লঙ্ঘন করে অমেয়তার অন্তঃকরণে ছড়িয়ে পড়তে চাচ্ছে। ফলে ছন্দের দোটানার ভিতরে পড়ে কখনো কবিকে গদ্য ও পদ্য ছন্দে প্রায় খবরের কাগজের লীডার লিখতে দেখা যাচ্ছে, কখনো বা ২২ ও ২৬ মাত্রার পয়ারে কিংবা প্রবাহমানতার পংক্তিপরম্পরার ভিতর দিয়ে যেন সে পৌঁছেছে নির্মুক্ত সমুদ্রে।

কিন্তু স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত বাংলার ছন্দে যে বহু পরীক্ষা সম্ভব হয়, উত্তীর্ণ হওয়া যায় ঢের উত্তরণলোকে, আধুনিক বাঙালী কবির সেদিকে ততটা মন নেই। তার এক দিকে, মাইকেলী তো নয়ই, মিল্টনী, এমন কি শেকস্‌পীয়রীয় অমিত্রাক্ষরের উদ্দীপনায় আধুনিক কাব্যছন্দের পরিপূর্ণ সফলতা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে তবুও এঁদেরই নির্দিষ্ট পথেই নতুন অভিযানে সে কি বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছে না—মহাকাব্য লিখবার জন্যে হয়তো নয়—আজকের অব্যবস্থিত বাংলার নাটককে মহা কবিতার প্রাণস্বরূপে উত্তীর্ণ করে দেবার মতো উপযুক্ত সমানধর্মী কাব্যছন্দ আবিষ্কার করবার জন্য, এবং সেই হচ্ছে নতুন যুগের ভাব ও চিন্তা প্রতিভা ব্যক্ত করে ছোট ও দীর্ঘ কবিতা সৃষ্টি করার জন্যে।

১৩৫৪

কি হিসেবে শাশ্বত

আমাদের ধারণা যে সাহিত্যে কোনো-কোনো লেখা অমর ও অবিস্মরণীয়। যেমন, মহাভারত হোমর শেক্সপীয়র রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি। মহাভারত ক হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল বলতে পারি না, তবে গ্রন্থটি ঢের পুরোনো বটে, হোমরও পুরোনো। মহাভারত সাহিত্যে আজো বেঁচে আছে, হোমরও। কিন্তু কি রকমভাবে বেঁচে আছে স্থির করে দেখতে গেলে বুঝতে পারব মহাভারতের ভিতরকার নানারকম নিহিত জ্ঞান ঠিক মহাভারত বইটির মূল সংস্কৃত বা বাংলা অনুবাদের ভিতর থেকে আমরা আহরণ—আয়ত্ত করেছি কিনা বলা কঠিন। খুব সম্ভব তা করিনি। মহাভারত পড়তে গেলে টের পাচ্ছি অন্যত্র আহৃত জ্ঞান ও সত্য মহাভারতের পাতায় সমর্থনলাভ করেছে বা খণ্ডিত হচ্ছে। এসব জ্ঞান আমরা ঢের আধুনিকতর নানা কালের দেশী-বিদেশী বইয়ের থেকে কিংবা বইয়ের বাইরে আমাদের আজকের অভিজ্ঞার মানুষী-পৃথিবী থেকে আত্মস্থ করেছি—সরাসরি মহাভারত থেকে নয়। আজ থেকে গত চার পাঁচশো বছরের ইউরোপীয় চিন্তা ও ভাল-বলয়ের কাছে আমরা কম ঋণী নই; আমাদের দেশের মধ্যযুগ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত ঢের দেশজ চিন্তা স্বপ্ন সংকল্প আমাদের অভিভূত না করলেও, সচেতন করে রাখছে, চেতনার দোর দিয়ে নির্মনে—অন্তঃশীল মনে প্রকাশ করে কি রকম ভিড় পাকাচ্ছে ঠিক বলতে পারছি না। আমাদের চেতনা ভাবনা শিল্প সত্য সাহিত্য রসিকতা এই সব গ্রন্থ সময় ও এখানকার নরনারীর সংস্পর্শের থেকে উৎসারিত আজকের মহাভারতই কয়েক হাজার বছর আগের মহাভারতের ভিতর পরিষ্কার চোখ কান নিয়ে অন্তঃপ্রবেশ করবার সুযোগ দিচ্ছে আমাদের। আমাদের স্ত্রী পুরুষ অন্ধকার দুর্ঘটনা আশা সংকল্প দিয়ে যে মহাভারত সৃষ্টি হচ্ছে,

পুরোনো মহাভারতের বৈরাট্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে সে যাচাই করে নিচ্ছে। এইসব উত্তরমহাভারত— যেমন শেক্সপীয়র-পরবর্তী ইংরেজি কাব্যলোক, রুশ উপন্যাস সঞ্চয়ন, উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যপরিমণ্ডল, গত দুই ও চলতি শতকের পশ্চিম ইউরোপের কথাসরিৎসাগর—এইসব মহাভারত আমাদের সময় ও চেতনার বেশি নিকটে থেকে বেশি সক্রিয় ও সত্যভাবে কাজ করছে। আমাদের এইসব আধুনিক মহাভারতগুলোকে পড়বার সময়—বা দ্বিতীয় বার পড়তে শুরু করলে বুঝতে পারা যাবে আমাদের ধারণা চেতনায় আদি মহাভারত প্রথম অঙ্ক হলেও এইসব পরবর্তী বইগুলো সমাজ ও সময়নাট্যের বিষম তৃতীয় অঙ্ক, মহৎ পঞ্চম অঙ্ক এবং যে মহাভারতকে আমরা শাশ্বত গ্রন্থ হিসাবে ধরে নিয়েছি—যতদিন মানুষের সভ্যতা থাকবে গ্রন্থটি তার অকৃত্রিম প্রথম নিজস্বতায় মানুষের সংবেদনার ভিতর সজীব হয়ে বেঁচে থাকবে এই হিসেবে—মহাভারত কিংবা কোনো অনুরূপ বড় সাহিত্যগ্রন্থই ঠিক সে হিসেবে শাশ্বত নয়!

মহাভারত তার যুগকে ধারণ করেছিল—পথের নির্দেশ দিয়েছিল; গল্প বলেছিল পৃথিবীর ইতিহাসের একটি প্রশস্ত সময়কে আবৃত করে; গল্প বলার পদ্ধতিতে মর্মস্পর্শী অসাধারণত্ব দেখিয়েছিল সামান্য জিনিসকে দিব্য—ও অলোকদেশী জিনিসকে সহজ উজ্জ্বল মর্মে প্রতিফলিত করে।

মহাভারতের পর কয়েক হাজার বছর কেটে গেছে। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রায় যে কোনো কালে যে কোনো মর্মগ্রাহী মানুষ নিজের যুগে নতুন মহাভারতের স্বাদ পেয়েছে—হয়তো মহাভারত পড়া ছিল বলে নিজের কালের চারদিককার আনুপূর্বিকতাকে পরম উত্তম একটা বিধানের ভিতর গ্রথিত করে নেবার কাজ খুব অসাধ্যসাধন বলে মনে হয়নি তার; গ্রথিত করে উপলব্ধি করে নিতে হয়েছে নিজের সময়কে। সেই মহাভারতই তার নিজের মহাভারত; হয়তো মহাভারত নয় আর; নানারকম তারতম্য এসেছে, মূল ভিত্তিও নড়ে গেছে তারপর উৎসাহিত হয়েছে; দেবতায়

বিশ্বাস নেই আর, কোনো অলৌকিক কৃষ্ণ নিরঞ্জনের উপর বরাত নেই, মহাশূন্যকে ব্রহ্ম মনে করে সকল বিপদ ও অন্ধকারের খণ্ডন নেই সেই অলীক আলোর ভিতর; জীন লোকায়ত হচ্ছে, জীবনের সমস্যা মানুষকেই স্থির করতে হবে, কোনো অগম পাহাড়চূড়ার ওপারের আকাশকে দিয়ে কিছু হবে না : সে উপলব্ধির বিষণ্ণতা ক্রমে আত্মনির্ভরের উজ্জ্বলতায় গিয়ে দাড়াচ্ছে; বিজ্ঞান অগ্রসর হচ্ছে, মানুষের কী আশা কী প্রশ্ন কী কাজ, নিষ্ঠা ও প্রতিভার সঙ্গে তার আলোচনা ও মীমাংসার চেষ্টা চলেছে—পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে যে চরিতার্থতা সম্ভব তাকে আয়ত্ত করবার জন্যে; মানুষ নিজেই এসে তারপর উৎখাত করে ফেলছে সব; তার আত্মঘাতী স্বভাবই কি ঠিক—হৃদয়ের পরিবর্তন সম্ভব কিনা—প্রশ্ন জাগছে। প্রথম মহাভারতেও এরকম নানা ধরনের প্রশ্ন এসে পড়লেও তার পরিপ্রেক্ষিত অন্যরকম ছিল, প্রশ্নগুলোর সমাধানও অনেক সময় যে দিব্য উপায়ে পাওয়া গেছে—আগা-গোড়া মহাভারতের ভিতর যে সব দিব্য রীতির প্রচলন রয়েছে তা খুব চমৎকার হলেও আমাদের পৃথিবীতে সেসব জিনিসের কোনো নিদর্শন নেই বলে সেই রীতিও এখন অচল। তবুও মহাভারতের গল্প—গল্প বলার সফল বৃহৎ অনিমেষ পদ্ধতি বেঁচে আছে; মানুষের জীবনে প্রবৃত্তির পরমাণু-খণ্ডনের মতো কোনো অদ্ভুত পরিবর্তন না এলে সভ্যতার শেষ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে বলে মনে হয়। পৃথিবীর খুব সৎ ও শিল্পশুদ্ধ গল্প-গাঁথা পড়বার জন্যে ও জ্ঞান—মানে মানবজীবনের—কয়েকটা দিকের মর্মার্থ বুঝবার জন্যে এবং কৌটিল্যের সূত্রগুলোর চেয়ে বেশি বৃহৎ ও মহৎ ভাবে মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যে আমাদের বরাবর আদি মহাভারতের দিকে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু তবুও মহাভারত আমাদের নিজেদের বা নিজেদের যুগের কোনো অন্তিম একক গ্রন্থ নয়। মুসলমান ও বৌদ্ধ যুগেও মহাভারত সে হিসাবে বিবেচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ।

মহাভারত আমাদের ভারতীয়দের প্রথম পথ দিয়েছিল বটে—সেদিনকার চরমোত্তম সাহিত্যের পথ এবং অনেক অংশে সাধারণ জনতার

বোধগম্য করে অনুভূতি উপলব্ধি ও জ্ঞানের পথ। প্রথম মহৎ দিকনির্ণয়ী হিসেবে সহজ সাধারণের কাছেও—দাঁড়িয়ে আছে মহাভারত— আমাদের ভারতবর্ষে অন্তত। কিন্তু তবুও উত্তরকালের একমাত্র পরিচ্ছন্ন ও গভীর দিকনিরূপক গণ্য হবার দাবী মহাভারতের মতো গ্রন্থের পক্ষেও সম্ভব নয়। মহাভারত রচনার পর অনেক করম উত্তরকালের আবির্ভাব হয়েছে পৃথিবীতে—এই বিংশ শতক অবধি। যে উপলব্ধির ভিতর থেকে মহাভারত রচিত হয়েছিল দ্বৈয়াপন আরো পাঁচশো বছর বেঁচে থাকলে সে উপলব্ধি তার পূর্ণ বিশুদ্ধতায় তাঁর নিজের মনেই অটুট হয়ে থাকত না। মহাভারতীয় উপলব্ধির 'শাশ্বত' পদার্থের ঢের ভাঙাগড়া কাজ করে গেছে তার অব্যবহিত পরবর্তী কালেই—প্রতিটি কালেই—প্রতিটি সময়সন্ধিতে। মহাভারত থেকে গল্প ও রূপক টেনে এনে আজকের শতাব্দীকে আলোকিত করতে চেষ্টা করতে পারি আমরা : করা হয়েছে; করা হবে; কিন্তু তা অগ্নিসংস্কারের মতো—আধুনিকতাকে নিজের সত্তায় ও সম্ভাবনায় বিশুদ্ধ করে নেবার জন্য—মহাভারতীয় কাল বা সেই দেশকালের শুদ্ধ উপলব্ধিকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে নয়। কিছুটা কাল কেটে গেলে পর সে উপলব্ধি নিজেকে শাশ্বত পদার্থ হিসেবে অনুভব করতে পারেনি আর। সে উপলব্ধির থেকে উৎপন্ন মহাভারতেও নিজের সমস্ত সর্বময়তাকে কোনো অংশে ক্ষুণ্ণ হতে না দিয়ে— যেমনটি একদিন ছিল ঠিক তেমনি জ্ঞান ধর্ম ও সাহিত্যের কিংবা এসবের কোনো কিছুরই একমাত্র সারাৎসার গ্রন্থ হিসেবে নিজের স্থায়িত্বের দাবী জানাতে পারে না। মহাভারতের ভিতর কোনো শাশ্বত দেশকাল নেই—মানুষীর সময় ও মনের গঠনের নিকট সে রকম জিনিস টিকে থাকতে পারে না বলে; প্রতিটি যুগেরই অলিখিত (তবুও চেতনায় স্বীকৃত) কিংবা তার বড় সাহিত্যিকদের হাতে লিখিত নিজস্ব মহাভারত আছে বলে। শেষোক্ত সব মহাভারত তাদের নিজেদের যুগে আদি মহাভারতের চেয়ে মানুষের কাছে নিকটতর, বেশি উজ্জ্বল। যুগ কেটে—নতুন যুগ এসে পড়লে তাদের শাশ্বত পদার্থ চিড় খেতে থাকে, ভেঙে যায়, বদলায় নতুনভাবে গড়ে ওঠে,

আগেকার সেই শাশ্বত দেশকাল থাকে না আর।

আমার মনে হয় দান্তের কাব্যর শাশ্বত পদার্থে এ রকম চিড় ধরেছে—আজ নয়—কিছুকাল আগের থেকেই। ইউরোপীয় পাঠকদের খবর আমরা বিদেশী বই জর্নাল ইত্যাদির মারফত পেয়ে থাকি। যতদূর টের পেয়েছি ইউরোপে কবিতা পাঠ করে যারা সেই নির্দিষ্ট সাধারণ, কিংবা আলোচনা করে যারা সেই সুধী রসিকের দল, দান্তের কাব্য তারিফ করে বটে, কিন্তু তবুও মূল ইটালিয়ান কিংবা ফরাসী জার্মান বা ইংরেজি ডিভাইন কমেডি তারা প্রায়ই পড়ে না। মহাভারত যেসব কারণে প্রথম ও অন্তিম হতে পারেনি সে রকম কতকগুলো কারণে দান্তের পক্ষেও সেটা হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি—মহাভারতের মতো অত অজস্রকাল কেটে যায়নি যদিও দান্তের মৃত্যুর পর। শাশ্বত শব্দটির যে মানে আমি ধরে নিয়েছি সে হিসেবে পৃথিবীর কোনো গ্রন্থই শাশ্বত হতে পারে না; সাহিত্যে ওরকম ধরনের সনাতন কিছু নেই। এক-একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক অমরসংসদে চলে যান বটে, কিন্তু তিনি শ্রদ্ধা জাগাতে থাকলেও ক্রমে-ক্রমে কেউ তাঁকে পাঠ করে না বিশেষভাবে আর : যে উপলব্ধি ও সাহিত্যসত্ত্ব প্রায় সকলের ভিতর বিতরিত হয়ে সার্থকতা পাচ্ছিল, নতুন দিনের সাধারণদের কাছ সে জিনিসের আবেদন কমে আসে—আরো অনেকদিন পরে রসিকদের কাছেও; সোফোক্লেস ঈসকাইলাসকে কেউ পড়ছে না বড় একটা, হোমরকে না, মহাভারত যেমন পড়া হয় না; মাঘে তিনটি গুণই রয়েছে, কিন্তু সে সব গুণ কি, সত্যিই কি আছে, থাকলে কি হিসেবে আছে বুঝে দেখবার জন্যে কে পড়ছে মাঘ আজকাল আর? বাণ কিভাবে তাঁর কাব্যে সমস্ত কিছুই উচ্ছিষ্ট করে গেছেন—এলিজাবেথীয় নাট্যকাররা যে বিশদ ব্যাপ্তির পরিচয় দিয়েছিলেন,শেক্সপীয়র যে আতল সমানুভূতি ও সার্বজনিনতার—সে সবের তুলনায় বাণের কাব্য কি রকম—কিংবা এমনিই কি রকম সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন তিনি—জানবার জন্যে এক-আধজন ছাড়া কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিংবা কথাটা এইভাবে বলা চলে যে আজকের কবি ও সাহিত্যরসিকদের চেয়ে এই রকম দুচারজন লোকই

ওসব বই বেশি পড়ে। আরো পরে তাদের সংখ্যা কমে যায়। লেখা কেউই প্রায় পড়ে না, তবুও লেখক অমর; মানুষের সফলতাকে মানুষ এর চেয়ে বেশি কর দিতে অসমর্থ; নিরবচ্ছিন্ন নির্গুণ সময় তাকে যা দেবে তার চেয়ে বেশি কিছু দান করবার শক্তি নেই তার।

কিন্তু দেশকালের খানিকটা অপরিমেয়তার নিকষে শাশ্বত না হলেও মহাভারতের মতো গ্রন্থ তার যুগের প্রতিটি পরবর্তীকালেই—এই বিংশ শতকেও নিজের চারিদিকে বেশ জনরব সঞ্চি ত করে প্রবেশ করেছে; আমি আগেই বলেছি যে খুব সম্ভব মানুষসভ্যতার শেষদিন পর্যন্ত মহাভারত আমাদের সঙ্গে থাকবে—দান্তেও—শেক্সপীয়রও। কিন্তু সাধারণজনেরা তো নিশ্চয়ই—কবিতার খুব মর্মস্পর্শী পাঠক ও সমালোচকদের ভিতরেও অনেকে মহাভারতকে খুব সৎ সনাতন—দান্তেকে চিরন্তন—বই হিসেবে মনে করলেও এসব বই শেলফে গুছিয়ে রেখে দিচ্ছে—কিংবা নিজের ব্যবহৃত কোনো গণগ্রন্থাগারে আছে বলে মনকে প্রবোধ দিচ্ছে; কখনো সম্পূর্ণভাবে একাগ্র সত্তাকে নিঃশেষে নিয়োগ করে এসব বই আজকাল বিশেষ কোথাও পড়া হয় বলে মনে হয় না। দান্তের চেয়ে মহাভারতের আকর্ষণ অবিশ্যি ঢের বেশি ব্যাপক—ঢের বেশি লোকায়ত—বেশি স্বরাট—স্বাভাবিক। কিন্তু দান্তের চেয়ে মহাভারতের পাঠকসংখ্যা কি খুব বেশি? ইউনিভার্সিটির সংস্কৃত সাহিত্য ইত্যাদি নানা পরীক্ষার জন্যে যারা প্রস্তুত হচ্ছে সে সব ছাত্রদের ভিতর কেউ-কেউ সংস্কৃত মহাভারত কিছু-কিছু পড়ে—কোনো-কোনো পর্ব-পর্বাংশ—কিন্তু আগাগোড়া সমস্ত বইটা পড়ে বলে বোধ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপকদের ভিতর কেউ-কেউ মূল মহাভারত পড়ে শেষ করেছেন একথা স্বীকার করতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাঁরা কজন, সংস্কৃত সাহিত্যে দর্শনের সমস্ত আচার্য অধ্যপকদের তুলনায় তাঁদের সংখ্যা কত, সে সম্বন্ধে আমার কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই। আমার মনে হয় সংখ্যা খুব বেশি নয়। সংস্কৃত দর্শন সাহিত্য ইত্যাদি চর্চার খুব প্রসার ছিল এক সময়; এখন ততটা নেই; পরে আবার হবে আশা করা যায়। এইসব ছাত্র ও অধ্যাপকদের গণ্ডীর বাইরে

যে সব অঢেল পাঠনিরতের সংখ্যা রয়েছে আমাদের দেশে তাদের প্রায় সকলেই অল্প বয়সে ছোটদের জন্যে সোজা ভাষায় সংক্ষেপে লেখা মহাভারত— বড় বইটার থেকে থিতোনো খানিকটা সরস গল্প—পড়েছে; পড়ে সুচিন্তিত হয়ে উঠবার সম্ভাবনা, আকৃষ্ট হবার কথা আদি মহাভারতের দিকে— সংস্কৃত না হোক, বড় প্রামাণিক বাংলা অনুবাদের দিকে। কিন্তু খুব কম পাঠকই সেদিকে ঝুঁকেছে—এত কম যে হক্সলী হেমিংওয়ে কোয়েস্টলার ইশারউড প্রভৃতির এদেশী পাঠকদের সঙ্গেও তার তুলনা হয় না, এত বেশি কম যে মহাভারতের সে সব পাঠকের কোনো অস্তিত্ব নেই বললেও চলে। কাশীরাম দাসের মহাভারত সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। খুব অপ্রত্যাশিত জায়গায় কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়া হয় বটে, কিন্তু সে সব প্রায়ই না-বুঝে আধো-বুঝে কর্মান্তরালে ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে পড়ে যাওয়া—তাৎপর্যের গভীরতায় প্রবেশ করা নয়। আদি মহাভারত গ্রন্থ অবিশ্যি আজকালকার সংস্কৃতি সভ্যতার বিরাট ইংরেজায়নের দিনে প্রায় সকলের কাছেই অগম্য। কিন্তু বাংলা অনুবাদ পড়ে দেখবারও বিশেষ কোনো তাগিদ দেখা যায় না। পাঠকদের ভিতর সকলেই প্রায় দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, সকলেরই সময় কম, সংসারের সমস্যা বেশি; আঠারো পর্বের মহাভারত আকারে খুব বড়, মহাভারতের মোটামুটি গল্প ছেলেবেলার পাঁচসাত ফর্মার বই থেকে পড়া, চারদিককার মানুষের মুখে-মুখে শোনা, নানারকম মাঝারি ও বড় সাহিত্যে ইতস্তত ছড়ানো, বড় বাংলা অনুবাদের দামও খুব কম নয়, বইগুলো কয়েকটি ভল্যুমে চালিয়ে দেওয়া নয়, বইয়ের খুব বিস্তৃত ও হৃদয়গ্রাহী বিজ্ঞাপন নেই—নানারকম বইগুলোর যে রকম আছে। এইসব নানা কারণেই—আমার মনে হয়—আধুনিক পাঠকেরা বড় মহাভারত পড়বার পথ খুঁজে পায় না। কিন্তু তবুও সবসময়ই একদল খুব ঐকান্তিক পাঠক আছে সাহিত্যের—উপরের বিস্তারিত কারণগুলো যাদের কাছে কোনো অন্তরায়ই নয় সাহিত্য আস্বাদের পথে। তারাও মহাভারত পড়ছে না আর। নিজেদের কালে কিংবা অব্যবহিত আগের যুগের বা আরো কিছু আগের মহাভারতগুলো (যেমন ঊনিশ-বিশ শতকের

বাংলা সাহিত্য, রুশ উপন্যাস-পরিধি, পশ্চিম ইউরোপের দু-তিন শতকের গল্প-বলয়, শেক্সপীয়র, উত্তকালের ইংরেজি কাব্য) পড়ছে যদিও। নিতান্ত না পড়লে যার চলে না এ রকম অধ্যাপক বা সাহিত্যিক ছাড়া আদি মহাভারতের সবখানি খুব নিবিষ্টভাবে পড়ে দেখবার সময়ই শুধু নয়—কোনো রুচিও নেই আধুনিক দিনের বিশিষ্ট সাহিত্য-পাঠকদেরও। কেন এরকম হচ্ছে ইতিপূর্বে সে সম্বন্ধে বলেছি। যে আশ্চর্য ও অব্যয় উপলব্ধির ভিতর থেকে মহাভারত জন্মেছিল একদিন, সে উপলব্ধিকে ও তার গ্রন্থকে শ্রদ্ধ করি আমরা; ঠিক ও রকম পরিধি ছড়িয়ে দিয়ে ওর চেয়ে মহত্তর জিনিস আমাদের সাহিত্যে অন্য কোথাও হয়েছে বলে বোধ করি না; কিন্তু তবুও সময়ের—মানুষের ধারা ধারণার—যেন এক চতুর্থ বিস্তারের দেশে দাঁড়িয়ে বিরাট নাট্যকে ঘিরে মহাভারতের মহাপ্রস্থান আমাদের কোনো পথ দেখিয়ে দেয় না। মহাপ্রস্থান (এই পৃথিবীতেই নবপ্রস্থান হিসেবে) আমরাও চাই যদিও—চাই শান্তিপর্ব ও সুসীম আস্তিক্যের সুর—কিন্তু কেবলি আকাশবাণীর উপর ভরসা রেখে—কেবলি দৈববলের সাহায্যে নয়। এই শেষের জিনিসগুলো এক হিসেবে মহাভারতের গল্প জমিয়েছে বটে, কিন্তু কোনো বড় গ্রন্থের সত্যার্থকে নিছক গল্প বা রূপক হিসেবে গ্রহণ করবার কথা নয় আমাদের, দ্বৈপায়নের দিনে সে হিসেবে তারা রচিতও হয়নি; ব্যাসের সমসাময়িক একমাত্র সম্ভাব্য শুদ্ধ চেতনা থেকে নিঃসৃত আধার ও আধেয়—মহাভারত—সত্য ছিল এবং সে সত্য শাশ্বত ছিল সময়ের সমাজের তখন; কিন্তু সে শাশ্বতকে সময় ভেঙে ফেলেছে এমনিভাবে যে আমাদের উপলব্ধিতে পুরাণ বা অনুরূপ মহামর্ম প্রণনয়নগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় যে সত্যের থেকে বিচ্ছিন্ন রূপক বা গল্পের থেকে বিচ্ছিন্ন সত্যের নির্মাণে রূপক আমাদের অসতর্ক মন চমৎকৃত করতে পারে, গল্প আমাদের মনে উঠতি মানুষকে বা স্থবিরকে মুগ্ধ করতে পারে, কিন্তু মহাভারতের সমগ্র বইয়ের ভিতর যে আশ্চর্য সাহিত্যরস ও কাণ্ডজ্ঞান আমরা পাই সে সব জিনিস মহাভারতের পর এত বিভিন্ন জায়গার থেকে এত বিভিন্ন কালসন্ধির নতুন-নতুন নির্ণীত

সত্যের স্পর্শে কিছু পরিবর্তিত বেশি আলোকতি হয়ে পরিবেশিত হয়েছে যে মহাভারতকে একটা অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে অনুভব করি আমরা, কিন্তু সময়ের সেতু পার হতে চাই তারি ভিতর থেকে উৎসারিত আমাদের শতাব্দীর ও জীবনের প্রয়োজনে স্থিরতর আধুনিকের অপরিহার্য স্পষ্টতর সব সম্বন্ধ-শৃঙ্খলের পথে। আমার মনে হয়, এই শেষ কারণের জন্যই বেশি করে—মহাভারত অমর হয়ে রয়েছে, কিন্তু পঠিত হচ্ছে না।

দান্তেও প্রায় অনুরূপ অমর। মহাভারতের তুলনায় দান্তের পটভূমি ছোট; কম্‌মেডিয়ার ভাবনা বেদনা শ্লেষ ধিক্কার আগুন ও গভীরতা সত্ত্বেও আমার মনে হয় একটা প্রায় অনিঃশেষ ক্রন্দসীকে আলিঙ্গন করে মহাভারত বেশি গভীর। কিন্তু দান্তে সময়ের দিক দিয়ে আমাদের ঢের নিকটে। ঠিক আধুনিক পৃথিবীতে বাস না করলেও আধুনিক ভাবপৃথিবীর (সব দিকের নয়, খুব কম দিকের নয় তবুও) পিতা হবার সুযোগ তাঁর ঘটেছিল। সে সুযোগ যে ডিভিনা কম্‌মেডিয়ার বিশেষ-বিশেষ কোনো খিচ রাখেনি, আজ এই বিশ শতকেও ইউরোপের কোনো-কোনো বড় কবির সাহিত্য ও শপথের দিকে তাকিয়ে সে কথা স্বীকার না করে পারা যায় না। কিন্তু তবুও দান্তের উপলব্ধির শাশ্বত জিনিসে মরচে পড়েছে অনেক দিন হল। উপলব্ধি প্রকাশের অদ্বিতীয় পদ্ধতি—যা আদি আধার ও আধারের মিলনীদেশের অনির্বচনীয় সত্যেরই সামিল প্রায়—সে রকম দান হিসেবে তাঁর কাব্য বেঁচে রয়েছে। বেঁচে রয়েছে—মহাভারতের মতো দান্তেও কালপ্রবাহী; প্রায় সব দিক থেকেই পাঠক আলোচক ও সাহিত্যিকেরা দান্তেকে নিঃসন্দেহে অমর বলে জানিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দান্তের ইটালীয়ান মহাকবিতা পড়ছে না কেউ; জার্মান, ফরাসী, ইংরেজি, রুশ অনুবাদগুলোও না। কম্‌মেডিয়ায় তখনকার ইটালীয় সমাজ রাষ্ট্র চক্রান্ত চরিত্রকূটের অতিবিষম ঠাসাঠাসি শত্রুমিত্রের কেচ্ছা ও কুৎসা আজকে পাঠকদের এত কম টানে যে অব্যয় আলোর স্পর্শ গ্রহণ করতে—আজকের দিনের সমার্সেট মম, লুই ফিশার, ওয়াল্টার লিপম্যান বা জওহরলালের বই হাতের কাছে থাকতে—প্রায় সকলেই নারাজ।

শেক্সপীয়র অমর। শেক্সপীয়রের উপলব্ধির অন্তঃসারে কিছুকিছু কলঙ্ক ও ছিদ্র দেখা গেলেও মোটামুটি তা এখনো গ্রহণীয়—অর্ধসত্যের চেয়ে বেশী সত্য; শেক্সপীয়র আধুনিক কালের সত্যার্থী। শেক্সপীয়রের পরে অনেক সাহিত্যিকই খুব বিশ্রুতভাবে আলোকপাত করলেও বিশ শতক পর্যন্ত কোনো দ্বিতীয় শেক্সপীয়র এসে দাঁড়াতে পারেনি আমাদের মধ্যে। শেক্সপীয়র অনেকেই পড়ে। পাঁচ-সাতশো—এক হাজার বছর পরে শেক্সপীয়রের অদ্বিতীয় প্রকাশ পদ্ধতি বেঁচে থাকলেও দান্তেকে উল্লঙ্ঘন করে তিনি সত্যিই ব্যাপকভাবে অধীত হয়ে আধার ও আধেয়ের একটি অবিনাশ সত্যস্বরূপের অনির্বচনীয়তায় অমর হয়ে থাকবেন—আশা করা যেতে পারে হয়তো। দান্তের চেয়ে শেক্সপীয়র মহাভারতের (বইটি পড়েননি যদিও তিনি) আদি দিকপতির মতো গভীরতা ও আকাশের ওপারে আকাশ, পৃথিবীর ভিতরে পৃথিবীকে বেশী হৃদয়ঙ্গম করে আধুনিক কালের প্রয়োজনে বেশি শুদ্ধ স্বচ্ছ ও সকলের গোচরে এনে নিজের বইগুলোর ভিতর গ্রথিত করে রেখেছেন। আমার এই ধারণা। কিন্তু সময় বয়ে চলেছে, আমরা সে সব জানব না কিন্তু সে জানবে—সাহিত্যে মৃত্যু অমরতা ও পুনঃপ্রবাহের আরো কোনো নতুন নিয়ম আছে কিনা, কিংবা যে-সব নিয়ম শৃঙ্খলা রয়ে গেছে সেগুলোর স্বতঃসিদ্ধতা সঠিকভাবে স্থির করা হল কিনা।

১৩৫৫

কবিতাপাঠ

ভালো—যাকে অক্ষর বলা যেতে পারে এরকম কবিতা পড়ে অনুভব করা যায় খুব হৃদ্য জিনিসের স্পর্শে এসেছি—এই কবির এই কবিতায় যা রয়েছে আমার অভিজ্ঞতায়ও সে জিনিস ছিল, কিন্তু ঠিক এরকম স্পষ্ট, কৃতার্থ সংস্থানের ভিতরে ছিল না; আমার চেতনা অনুচেতনার দেশে যে সব অভিজ্ঞতা এই কবিতাটিকে ঠিকভাবে গ্রহণ করবার মতো উপযুক্ত তারা এসে উপস্থিত হয়, উপলব্ধি করতে পারা যায় করুণা বা অপ্রেম বা সঙ্কটের বলয়ের ভিতরে গিয়েছিলাম কিছুকাল আগে, পরে বেশি অনিমেষভাবে ব্যক্ত হল সব কিছু : উঁচু উঁচু গাছ দেখেছিলাম, বাতাস, পাখি, কাছে কোথাও অনেকখানি জল ঝিকমিক করছে রোদে—অনেকদিন ভেবে দেখিনি সে সব কথা; কবিতাটি স্মারক আঙুলের মতো এসে আমার বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতাকে ডাক দিয়ে সচেতন করিয়ে দিল আবার। আবার বোধ করা গেল প্রত্যন্তের দেবদারু জল পাখি আকাশ এবং কী তাদের মর্মার্থ ব্যক্তি ও তার প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে; কিংবা পট আরো অনেক বাড়িয়ে দিয়ে অনুভব করি কী তাদের সম্বন্ধ শ্রী লক্ষ্য—মানুষ সংসার জীবন আচলমান মানবীয় বৃত্তান্তের ভিতর। সৎ কবিতার স্পর্শে এসে আমার নিহিত অভিজ্ঞতার একটা আশ্চর্য পুনরুত্থান ঘটল এরকম ভাবে। ক্রিশ্চানেরা ঈশার পুনরুদয়ের কথা বলে; আমাদের দেশে যোগ করে আচ্ছন্ন শক্তির নির্মল রূপ দেখতে পাওয়া যায়—আত্মাকে চিনতে পারা যায়—এমন কি ঈশ্বরেরও দেখা পাওয়া যায়—বলা হয়। এসব ব্যাপার সম্পর্কে কোনো মতামত ব্যক্ত করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আত্মা বলে কোনো জিনিস খুবই আড়ষ্ট অবস্থায় মানুষের সত্তার ভিতর থাকে—সেই আচ্ছন্নতার থেকে খসিয়ে নিয়ে শুদ্ধভাবে যদি তাকে বোধ করা সম্ভব হয় আমাদের জীবনের স্পষ্ট স্বচ্ছ মুহূর্তে, তাহলে আমরা সচরাচর যা

দর্শন করি তার চেয়ে বেশি কিছু দেখতে পারি—সাধারণত যা আস্বাদ করি তার চেয়ে ভালো আস্বাদ পেতে পারি কোনো এক মহত্তর আধেয়ে পরিণত হবার শক্তি লাভ করে—আত্মসত্যার্থীদের মুখে এরকম কথা শুনে এসেছি, বয়স্ক মন নিয়ে বেশি কবিতা পড়বার সুযোগ পাওয়ার কিছু আগের থেকে। আত্মা ও আত্মাকে চেনবার বোঝবার নানা উপায় স্থির করা ও পথের থেকে বাধা দূর করার তাগিদ বিশেষ সব দেশে ও সময়ে কোনো কোনো মানুষের চরিত্রের ভিতর অনেক দূর প্রবেশ লাভ করেছিল; আজকালও স্থানে স্থানে করে। কিন্তু তবুও আত্মা কি—আত্মাকে দেখেছেন কিনা তাঁরা—সকলেই কি এক রকম ভাবে দেখবে—এসব সম্বন্ধে কোনো গাণিতিক সত্যে পৌঁছনো সে সব দৃষ্টিকামীদের পক্ষে বাস্তবিক সম্ভব হয়নি। গাণিতিক সত্য খুব সম্ভব বলছে, আত্মা নেই; মানে আত্মা বলতে সচরাচর যা বোঝা যায় তা নেই। আজ অন্তত এই কথা বলছে। কাল কি বলবে বলতে পারা যায় না।

কিন্তু সৎ কবিতা নেই, একথা গণিত বলছে কি? ভালো কবিতা পড়ে আমার অভিজ্ঞতার কোনো একটা উপেক্ষিত (খুব সম্ভব বিশৃঙ্খল) অংশে সম্বিৎ এল—গোছানো হতে লাগল সব—কবি যা দেখাতে চাচ্ছে আমি ভিন্ন ব্যক্তি বলে সবটা সম্পূর্ণভাবে দেখতে পাব না, কিন্তু আমার মনশ্চক্ষে অনেকখানিই দেখলাম—আমার অভিজ্ঞতার একটা অংশ সঙ্গতিসাধনের স্বস্তি লাভ করল, সার্থক সব কবিতার ভিতর দিয়ে যে সঙ্গতি সম্ভব হয়; আনন্দ পেলাম। *এসব অপ্রমাণিত করবার মতো গণিত বা বিজ্ঞান যদি থাকত তাহলে মানুষের ভাবনা চেতনা হৃদয়—এদের উন্মেষ বা পরিণতির প্রশ্ন নিয়ে কোনো কথা আর চলতে পারত না। কিন্তু উন্মেষ হয়েছে; পরিণতির দিকে অনেকদিন পর্যন্ত চলেছিল তো; আরো চলবে মনে হয়। মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দ-চেতনার জন্ম হয়েছিল, তারপরে কবিতা

---

* আমাদের কথাবার্তা ও যুক্তিতর্কের চেয়ে এ স্বাদ অন্যরকমের; জীবনের যে কোনো মুহূর্তে যুক্তিতর্ক চালাতে পারি, কথা বলতে পারি, কিন্তু আরো কিছু

এল; মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত এ সাহিত্য থেকে যাবে আশা করি। সময় দেশ ও সন্ততিদের ব্যাপ্তিতে গ্রথিত ও গভীর সব কবিতা পড়ে অনুভব করতে পারা যায় কোথায় কোথায় আমার অভিজ্ঞতা নামমাত্র সিদ্ধি লাভ করেছিল শুধু, কোন কোন দিকে কতদূর অসুস্থতা রয়েছে তাদের ভিতর, কি রকম ভাবে তারা নানা তথ্যে থিতিয়ে উঠেও অজ্ঞান তবু : কোনো চেতয়িতাকেও চাইছিল না যেন—কি করে ধীরে ধীরে শৃঙ্খলার পথ দিয়ে সেই স্পষ্ট, সত্য অভিজ্ঞতায় ফিরে এল যা আমি (ওসব কবিতা পড়বার আগে) সংসারে সমাজে লাভ করেও জীবনে লাভ করতে পারিনি, ইতিহাস বা সময়ের আরও কিছু বেশি নিরঞ্জনের ভিতরে এখনো লাভ করেছি কিনা সন্দেহ, কিন্তু বিশেষ সুযোগ খুলে গিয়েছে টের পেয়েছি।

কবিতার একজন পাঠক, খুব সম্ভব আলোচক, হিসেবে এইসব কথা বলছি। ও-দেশে কবিতার পাঠকও যে খুব কম তা নয়। আমাদের দেশে আগের চেয়ে বেশি হলেও এখনো ঢের কম; বাড়বে মনে হচ্ছে। কবিতার অভিজ্ঞ পাঠকদের ভিতর গোত্র গোত্রান্তরের রক্তের খুব প্রখর বিভিন্নতা না থাকলেও তাদের সকলের দৃষ্টিসিদ্ধি একরকম নয়, রুচি একরকম নয়—খারাপ বা ভালো কবিতা চিনে নেওয়ার ক্ষমতা, কবিতা পড়ে সিদ্ধান্তের ক্রমিক নির্মলতায় পৌঁছবার শক্তি এক রকমের নয়। কিন্তু একই যুগের যে সব পাঠকেরা ভেবে বুঝে (বোঝবার একটা নির্দিষ্ট মান অন্তত বজায় রেখে) কবিতা পড়ে কম বেশি অব্যর্থ স্বাদ পায় তাদের আস্বাদ ও অনুভূতির পার্থক্য পরস্পরের থেকে খুব বেশি বা প্রবল নয়। খুব বেশি? সমসাময়িক কালের বাইরে তাকালে ব্যাপারটা স্পষ্টতর ভাবে

সুস্থির ও তদগত না হলে শাদামাঠা কবিতা পড়েও স্বাদ গ্রহণ করা কঠিন। কবিতা আরো সৎ হলে পাঠকের কাছ থেকে সুস্থিরতা ও নিবেশের দাবিই করবে না শুধু, পাঠকের অভিজ্ঞতা ও তার মূল্য সম্বন্ধে চেতনা কি রকম বুঝে দেখবে। এত সব দাবি। এদের তৃপ্তিসাধন (ভালো পাঠকের বেলায়ও) সব মুহূর্তেই ঠিকভাবে সংস্থিত হয় না। কবিতা পড়ে তাই আন্দাজি মতামত প্রকাশ বা অসার আলোচনা অনবরত হচ্ছে, আরো কম হত, আরো ঠিকভাবে পড়তে পারলে।

বুঝতে পারা যাবে। আঠারো উনিশ শতকের একজন মোটামুটি সার্থক বাঙালী পাঠককে আজকের বাংলার কোনো সঙ্গত, ভালো কবিতার সংকলন পড়তে দিলে, আমার মনে হয়, আজকের কাব্যের আধুনিক বিরোধীর চেয়েও বেশি ফাঁপরে পড়বে সে; এ যুগ তো তার নয়, এ সাহিত্যও নয়; শুধু ভাষাই যে বদলেছে নতুন বইয়ে তা নয়; সাহিত্যে যে সব প্রাণ ও অভিজ্ঞানগুলোকে যে রকম নীতির ভিতরে শাশ্বত মনে হয়েছিল সব কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে এত, যে প্রাণ বলে কোনো জিনিস আছে কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহ ঘোচানো— আজকের যুগের ভিতর ক্রমাগত দীক্ষিত হতে না থাকলে—সে পাঠকের পক্ষে কঠিন; হয়তো অসম্ভব। কোনো দেশের এক যুগের সমস্ত সৎ পাঠকও একই কবিতার প্রাণস্বরূপ বা তার অভাব সম্পর্কে একই মতে পৌঁছতে পারত যদি তাহলে ভালো হত হয়তো; কিন্তু মানুষের রুচি দীক্ষাশিক্ষার বিভিন্ন নমুনাগুলোকে একই তিলে এনে মেলাবার ক্ষমতা গণিতের যতটা কবিতার ততটা নেই। বিভিন্ন সিদ্ধান্ত জাগায় মনে—বিচিত্র ভাব—একই কবিতা—ভিন্ন ভিন্ন পাঠকদের ক্ষেত্রে,—তাদের রুচি-বিচারের ভিতর নানা রকম উনিশ-বিশ রয়ে গেছে বলে। এ প্রাথমিক সত্যের নিজেরই অব্যর্থ শাঁস আছে।

কোনো একটি অনশ্বর কবিতা প্রচুর অভিজ্ঞতা দাবি করে পাঠকের কাছ থেকে; ভাসা ভাসা অর্থ পেরিয়ে উপলব্ধির আলোয় অর্থের অনমনীয় শিবত্বে পৌঁছনো দরকার। একবার পৌঁছতে পারলে পাঠকের মনের নমনীয়তায় আধেয় হিসাবে থাকবে সে। কবিতাটির ভিন্ন ভিন্ন মানে বেরুবে একজন ও বিভিন্ন পাঠকের অর্থকৃৎ মনের বিভিন্ন রকমের আলোকিত অবস্থায়। অর্থ অস্বচ্ছ বোধ হলে কবিতাটির ধ্বনিগুণ সম্পর্কে অন্তত চেতনার স্পষ্টতায় পাঠকের সুবিধা হবে মনে হয়; কবিতাটির ইঙ্গিত ধরা পড়বে তাহলে; অর্থ পরে বোঝা যেতে পারে। কবিতার এসব দাবি মেটাবার মোটামুটি শক্তি অন্তত না থাকলে তাকে সমাজচেতন (বা অব্যাহতিজীবী বা ইতিহাসবেদী) বলে নাম দিয়ে তার দোষগুণ সম্বন্ধে যে মীমাংসায় পৌঁছনো যায় তার সঙ্গে নিজের বিশেষ কোনো সম্পর্ক

থাকে না কবিতার। অনেক স্থলেই তাকে সমাজমর্মী ইত্যাদি যে সব নামে ধার্য করা হয়েছে সেই আধারের গুণ ও দোষের বিশ্লেষণে বুঝতে পারা যায় না কবিতার অনিমেষ স্বভাব ও সম্পন্নতা কোথায়—কি করেই বা পাঠকের উৎসাহে বিশেষ ধরনের আলোচনায় জড়িত হয়ে সে বেশি প্রশংসিত হচ্ছে, কিংবা নিন্দিত।

ইতিহাসবেদের দরকার—এবং সমাজবেদের; কিন্তু সব কবিতায়ই একই ভাবে, অথবা কোনো কবিতায়ই উত্তমর্ণ হিসেবে নয়; কবিতার চেয়ে তার উপকরণ বড় হবে না। এই সব বেদের একান্ত মর্মজ্ঞানের ভিতর থেকে যে কবিতাগুলো ক্রমে ক্রমে তারপর উৎসারিত হয়ে এসেছে, আমার মনে হয় সেসব কবিতায় বেদ যথাস্থানে আছে—কবিতাগুলোকে গ্রাস করতে পারেনি। যেখানে কবিতায় ইতিহাস ও সমাজ ইত্যাদিকে বোধবিচার করবার আগ্রহ বেশি, সাধনা ও শক্তি কম—সেখানে কবিতাতে সমাজদর্শী বা সাহিত্যকে ধাতা নিয়ন্তা (সমাজের) বলে প্রশংসা করবার তাগিদ—খুব সম্ভব প্রথা—রয়েছে অনেক পাঠক এমন কি সুধী সমালোচকদের ভিতরেও; কিন্তু বাহন হিসেবে কবিতাকে ব্যবহার করে সেখানে লেখকের সৎসামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কি? আমি যত দূর বুঝতে পেরেছি তা চরিতার্থ হয়নি, বাহনও ধিব্রত হয়ে পড়েছে।

অনেক কবিতা আছে, মানববৃত্তান্তের কোনো এক বিশেষ অধ্যায়ে তাদের জন্ম যদিও, কিন্তু অন্য কোনো সমাজের জন্ম হতে পারত, বৃত্তান্তের অপর কোনো স্তরে—হয়তো ভবিষ্যতকালের—এমন কি ঢের দূরের ভবিষ্যতের। আজকের সমাজকে আর অন্বেষার মর্মে (কমবেশি) সফল আলো দেখিয়ে এসব কবিতা ভবিষ্যতে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে যে তা নয়; এ কাব্যে জাতীয় আলো দেখা যেতে পারে, কিন্তু সমস্ত কাব্যে যে আলো প্রথমেই স্পষ্ট, শেষ পর্যন্ত স্থায়ী, সব চেয়ে স্বাভাবিক সেইখানেই আলোপ্রতিভার নিধান; তা কবিতার। বিশ শতকে জন্মগ্রহণ করেছে ও কাজ করেছে বলে উনিশ শতককে কৃপার পাত্র, বা কোনো অনেক আগের সুন্দর অতীতকে একমাত্র সাধ ও শ্রদ্ধার জিনিস মনে করার তাগিদ

অতিক্রম করে এসব কবিতা—রামমোহন যখন ছিলেন বাঙলাদেশে কিংবা বাঙলার পট যখন তৈরি হয়েছিল অথবা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যখন আলোড়িত হয়ে ফিরছিলেন, আজকের দিল্লী, ক্রেমলিন ও ন্যুইয়র্কের পরিণতি, কাল যারা জন্ম নেবে—সব মানুষেরই নাড়ীকম্পন অনুভব করছে যেন, আজকের সূর্য জল ও নক্ষত্রদের দেখতে দেখতে অনেক কালের প্রকৃতিকে; বিফলতা দুঃখ ও আশাকে; বিশেষ কোনো যুক্তি নেই মানুষের অন্তিম ব্যর্থতার বিপক্ষে—দীনাত্ম হৃদয়ে সেই কথা মনে রেখে। এসব কবিতার বৃত্তান্ত, আজকের স্বভাবী বা নিদারুণ বৃত্তান্তও প্রধান নয়, যা হয়ে গেছে যা হতে পারে সবের ভিতরে খতিয়ে আজকের বিশেষ উপলব্ধির পথ পরিষ্কার করে রাখবার চেষ্টাই আসল। আজকের এটা ওটা সেটার খুব কাছে আমরা, ঠিক; কিন্তু খুব শিগগিরই ওগুলো ছড়িয়ে পড়ে, সরে যায়, সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ আজকের সাথে মিশে গিয়ে বর্তমানকে স্পষ্টতর ভাবে গঠন করে; রাষ্ট্রপালরা দেশের বা পৃথিবীর বর্তমান সময়টাকে এ হিসেবে প্রায়ই দেখেন না, রাষ্ট্রের লোকরাও না। দেখবার শক্তি অবসর বা ইচ্ছা—কিসের অভাব—খুব সম্ভব বিশেষ কিছুরই অভাব নেই, এদের অনেকেরই, ছোট ছোট পরিপ্রেক্ষিতের ভিতরেও চিন্তার স্পষ্টতার অভাব ছাড়া; সামাজিক শৃঙ্খলা আয়ত্তে আসছে না তাই; কঠিন মনে হচ্ছে, অসম্ভব মনে হচ্ছে।

সেকালের সমাজ বা সময়ের মানুষ, বিভিন্ন পদ্ধতির উৎসায়নে (ও মূল্যায়নে) প্রেম, বা এখনকার প্রকৃতি, অথবা আজকের সমস্যা, যে কোনো জিনিসকেই কবিতা তার নিজের শরীরে গ্রহণ করে তার এমন কয়েকটি সম্ভাবনায় তাকে এত স্পষ্ট করে দেখে যে বুঝতে পারা যায় নিজ স্বভাবে যে ব্যাপারটি রয়েছে তাকে যতদূর সম্ভব তার স্বরূপে—প্রতিবিম্বের আশ্রয়ে ততটা নয়—চেনা গেল। এর চেয়ে পরিষ্কার করে চিনতে হলে আরো দৃষ্টি-সাধনার প্রয়োজন কবির; সে সাধনা সত্য হয়ে উঠতে পারে পৃথিবীতে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আরো বেড়ে যেতে থাকলে। সঠিকভাবে বাড়ছে না আজকাল আর তেমন। কিন্তু কিভাবে আমাদের

চেনা জানা জ্ঞানের সহায়তায় আজকের অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানের ব্যবহার করতে হবে দৃষ্টিতে ও ধারণায় আরো বেশি প্রবেশশক্তি ও শান্তি পেতে হলে— সেটা প্রত্যেক যুগের বড় কবিতায় ব্যক্ত হয়ে উঠেছে; অনুভব করে স্থির করে নিতে হবে পাঠককে।

কবিতার আজকাল ও ভবিষ্যৎ এইরকম। বাঙলাদেশে কবিতার একটা ভালো অতীত ও আধুনিকতা রয়ে গেছে, অন্য সব দেশেরই সৎ কবিতার ভবিষ্যতের সঙ্গে সেটা গ্রথিত হয়ে চলবে মনে হয়; কখনো ভিড়ে চাপা পড়ে, কখনো পিছিয়ে থেকে, কখনো বেশি আলো দান করতে সক্ষম হয়ে। আধুনিক বাংলা কবিতা চাপা পড়েনি, কিন্তু বিশদ ও পরিচ্ছন্নভাবে আলোকিত হয়েছে? এখনকার বাংলা কবিতার কাল সমাপ্ত হয়নি : ক্রমে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করা দরকার হবে এই কাব্যের; অধ্যয়ন ও আলোচনার ফলাফল ও পদ্ধতির উপর আজকের এই বিশেষ সময়ের অনেকখানি ছাপ পড়বে বটে; সেটাকে এখনই সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ করা অসম্ভব, পরে ক্রমে ক্রমে হবে, আসছে-কালের সমালোচকদের হাতে— তাদের সময় পর্যন্ত লভ্য কবিতার ধারার আরো খানিকটা ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতের ফলে। মানুষের মন ও হৃদয় বিশেষ বদলায় না যদিও, কিন্তু প্রতি যুগেই ঘটনা ও জীবন সমাবেশের এমন একটা আশ্চর্য নতুনত্ব দেখা যায় যে সাহিত্যের অর্থ ও লক্ষ্য সে আলোয় আগের সব যুগের থেকে খানিকটা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিফলিত হয়ে উপস্থিত হয়; কালকের কবিতা ও তার আলোচনা আর এক রকম হবে; আজকের কবিতা ও তার আলোচনা আর এক রকম হবে; আজকের কবিতারও ভাবী আলোচনার পথ কেউ কেউ দেখছি আমরা, কিন্তু পথের সীমানায় কি আছে ততটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি না। তারপরে আরো পরের ভবিষ্যৎ রয়েছে—আমাদের সঙ্গে ধারণাভাবনার পার্থক্যের শুধু কিছু উনিশ-বিশ নিয়েও বেশ খানিকটা অস্বচ্ছ। আজকের পাঠক ও আলোচকের পক্ষে অনেকটা অগম এই সব ব্যাপারকে— তবুও—ধ্যান ও বিচারের ভিতর যতদূর সম্ভব আয়ত্ত করে নিতে হবে; আজকের দিনের বিশেষ প্রসাদ তাকে রক্ষা করতে চাইলেও

এ যুগের কাব্য থেকে কোনো জিনিস মুছে যাচ্ছে, তেমন কোনো মনোযোগ লাভ করতে না পারলেও কী জিনিস টিকে থাকবে—আরো কিছু পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারবে তাহলে পাঠক; টের পাবে দেশ সন্ততি ও সময়ের সমস্ত আলোচনার মিল অমিল সত্ত্বেও কতকগুলো কবিতা মানুষের সমাজের পর পর সব নতুনত্বে ও আলোড়নে ধ্বংস হয়ে যায় না, মানুষ নিজে যে, সত্যে বিভিন্ন অর্থ ও লক্ষ্যের চলাচল সত্ত্বেও অনেকখানি একক—কম বেশি স্থিত ও নিঃসময়—এই সব কবিতায় সে সময় ও সে সত্য আছে।

বিজ্ঞানে জীবনের উপর মন্তব্য রয়েছে, কিন্তু এখানে মন্তব্য স্পষ্ট ও তনুশুদ্ধ হয়ে স্বভাবতই জীবন। তবুও আমরা আলাদা জীবনযাপন করি পৃথিবীতে; সেইটিই আমাদের নিজ জীবন এবং আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি স্বাভাবিক। পৃথিবী লোকসাধারণ ভাবে সৎ হলে এরকম হত না। ক্রমেই সৎ হবে আশা করা যেতে পারে, কিন্তু কবিতার স্থির মর্মগ্রাহী বিচার ওরকম ভাবে সাধারণ হবে কোনোদিন—আশা করা কঠিন।

১৩৫৬

দেশ কাল ও কবিতা

কবিতা বলতে যদি কোনো এক দেশের এক-আধ-শতকের কাব্য বোঝাত তাহলে কবিতা সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ আলোচনা বেশি সহজসাধ্য হত, বেশি সফলতা, প্রায় গাণিতিক শুদ্ধি আশা করা যেতে পারত। কিন্তু এখনকার দু-এক-শতকের কবিতা ছাড়া আরো কবিতা আছে নানা দেশে। বিশেষ সুধি মানুষদের পক্ষেও এই যাবতীয় কবিতা পড়ে দেখা সম্ভব নয়। সে রকম অধ্যয়নের কোনো দরকারও নেই। কিন্তু এদেশ ও অন্য কোনো-কোনো দেশের কয়েক শতকের প্রথম শ্রেণীর কবিতার সঙ্গে যত বেশি পরিচয় থাকে সমালোচকের—বেশি স্পষ্ট, আয়তগভীর ধারণায় পৌঁছনো তার পক্ষে ততই সুসাধ্য হয়। কাব্য সম্বন্ধে কোনো ধরাবাঁধা সংস্কার নিয়ে এ সব দেশ ও সময়ের কবিতা পড়া উচিত হবে না। বিপ্লবী বা নির্বিপ্লবী, কিংবা সমাজ ও ধর্ম ইত্যাদির মুখপাত্র হওয়া উচিত কবিতার অথবা এসব জিনিসের দিকে মোটামুটি পিছ ফিরিয়ে অবচেতনে ও নির্মনে সিদ্ধি লাভ করা উচিত—এ রকম কোনো অবচেতনে ধারণা নিয়ে কবিতা পাঠ করতে গেলে নানারকম উপকরণ সংগ্রহ হবে, কিন্তু সমালোচকের বোধ জ্ঞানে পরিণত হতে পারবে না। যে কোনো সাধারণ বুদ্ধিমান পাঠকই অনেক কাব্য পড়ে পণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু সুজাত সমালোচক ও-রকম পাঠকের চেয়ে কম কবিতা পড়েও কাব্য জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে বেশি জ্ঞানগভীর হবে। পড়া দরকার বটে যত বেশি সম্ভব দেশ ও কালের কবিতা; কিন্তু খারাপ কবিতার থেকে ভালো কবিতা বেছে নেওয়ার কুশলতা, নানা রকম কবিতার জাতি ও স্তর নির্ণয় করবার ক্ষমতা সকলের এক থাকে না। এ বিষয়ে স্বভাবতই কারো বেশি শক্তি থাকে অন্যদের চেয়ে, কবিতা পড়ে স্বভাবতই বেশি স্বাদ পায় সে; কোনো কবিতা সার্থক—এবং কি ধরনের,

কোনো প্রস্থানের, অনুভব করে, কবিতা কখন বিশেষ আলোকসত্ত্ব হল সেটা পরে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে স্থির করতে হয় তাকে; কিন্তু কবিতাটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই এটা ঠিক, বা ততটা ঠিক নয়—সমর্থন অসমর্থন আসতে থাকে। ভালো সমালোচকের মন অনেক বেশি কবিতা পড়ে আরো কুশলী হয়ে উঠবার আগেও এ রকম খানিকটা পরিষ্কারভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। এটা হচ্ছে সম্ভাবনা, সিদ্ধি নয় : প্রাথমিক সম্ভাবনা নয় যদিও : তার চেয়ে উপরের জিনিস। এই উপলব্ধি নিয়ে দেশসময়ের যত বেশি সম্ভব শ্রেষ্ঠ সব কবিতা পড়া দরকার—ক্রমেই বেশি বোধ লাভ করতে হলে।

পৃথিবীর সমস্ত কবিতা পড়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়; কিন্তু প্রথমত নিজের দেশের সমস্ত কালের ভালো কবিতাগুলো পড়া দরকার। আমাদের (বাঙলা) দেশে এদিক দিয়ে পাঠক ও সমালোচকদের খুব অসুবিধা; জীবিত কবিদেরও অনটনে পড়তে হয়—নিজেদের দেশের বড় ধরনের পূর্বজ কবিদের সমস্ত লেখা—গদ্যও—দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে না; (কিনতে পাওয়া গেলে সব কিছুই কেনবার মতো পয়সা যে অনেকেরই নেই সেটা অবিশ্যি ভিন্ন কথা); কোনো কোনো লাইব্রেরিতে কিছু বই আছে, সব নেই; সব সময়ই হাতের কাছে ভালো অবস্থায়—ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে যে রকম তা যে নেই এই নিয়ে আন্দোলন বা আপসোস করবার অবকাশ নেই। কোনো কোনো মনীষী, অধ্যাপক, বা কবিতার সুহৃৎদের বাড়িতে আছে এসব বই? থাকতে পারে : কিন্তু কবি ও আলোচকদের পক্ষে ব্যবহার করবার মতো স্বাচ্ছন্দ্যে পাওয়া যাচ্ছে না এসব গ্রন্থ; কোনো দিন পাওয়া যাবে কিনা বলা কঠিন। আমাদের দেশের প্রকাশকেরা সকলেই দরিদ্র নন, অনেকেই সক্রিয়, কিন্তু মৃত কবিরা বড় হতে পারেন, তাহলেও তাঁদের বাজার নেই, কি করবেন প্রকাশকেরা? দাতব্য ব্যবসা? আধুনিক কবিতারও পাঠক খুব কম, সেকালের কবিতা কোথাও যে লাইব্রেরিতে টিকে আছে এই চেতনাই ঠিক। এর চেয়ে চেতনার অধিক সার্থকতায় স্থিত হতে গেলে অনেক বছরে স্বাধীনতা মর্যাদা ও জাতির একটা উত্তম

ঐতিহ্যের দরকার; সে দরকার প্রায় মিটে গেলে তবে ফ্রান্স্ ও ইংলণ্ড ও রাশিয়ার পাঠকদের সাহিত্যসুগমতার তুলনায় নিজেদের অবস্থা বিবেচনা করবার সুযোগ পাওয়া যাবে; সে সুযোগ নেই এখন।

কিন্তু তবুও যে করেই হোক আলাওল থেকে আজ পর্যন্ত বাঙলা দেশের কবিতা প্রথমেই পড়ে নেওয়া উচিত—এ দেশের সমালোচকের; সংস্কৃত কবিতার কোনো পরিপ্রেক্ষিত থেকে থাকে যদি মনে—সেটা স্পষ্ট করা, না থাকলে লাভ করা দরকার; ইংরেজি ও ফরাসী কবিতা সম্পর্কে অনুভাবের মোটামুটি স্বচ্ছতা থাকলে সমালোচকের বনিয়াদ তুচ্ছতা কাটিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে; তার পরে ক্রমে-ক্রমে সিদ্ধি লাভ করতে পারা যাবে আশা করা যায়। এত সব পড়েও সকলেই বড় সমালোচক হয় না, দু'একজন হয়। কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে, না পড়ে অশিক্ষিতপটুত্বও ঠিক জিনিস নয়। জ্ঞানেরই দরকার বেশি, সেই জন্যই অধ্যয়নের দরকার। অধীত জিনিস থেকে প্রজ্ঞা লাভ করবে কি সমালোচক না পাণ্ডিত্য? প্রথমটির ভরসাই অধ্যয়ন, পাণ্ডিত্য দিয়ে কবিতায় সমালোচনা বেশি চলে না। আমাদের দেশের অনেক সমালোচক ও কবিরই ফরাসী জানা নেই, না জানা থাকলে প্রামাণ্য ইংরেজি অনুবাদে যা পাওয়া যাবে তাতেও লাভ হবে। ইংরেজি কাব্য আরো প্রধানভাবে পড়া উচিত, ইংরেজি কাব্য ফরাসীর চেয়ে সর্বদা বড় বা মহত্তর বলে নয় (তা নয়, ফরাসী কাব্য কোনো-কোনো সময় ইংলণ্ডের বড় কাব্যের পথ কেটে দিয়েছে, ঢল নামিয়েছে), বিনা অনুবাদে কবিদের নিজেদের মাতৃভাষা ও রীতিতে সে সব কাব্য পড়া সম্ভব বলে। গ্রীক—এবং প্রায় সমস্ত প্রধান ইউরোপীয়—কবিতাই ইংরেজি অনুবাদে সুপরিসরভাবে বিন্যিত হয়েছে। আমাদের দেশের গুজরাটি মারাঠি তামিল ভাষাও প্রায় কারুরই জানা নেই—হিন্দী অবিশ্যি জানা আছে অনেকের—উর্দুও কারো কারো; এসব ভাষায় যে কবিতা রচিত হয়েছে সে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ না করে আগেই আমি ইংরেজি ফরাসী কবিতার কথা বলেছি মুদ্রদোষে নয়—হেতু আছে তাই। যে সময় ও সংস্কৃতি আমাদের জন্ম দিয়েছে তাতে ইউরোপীয় সাহিত্যের

কাছ থেকে বেশি, বিশেষ আলো নেওয়া ছাড়া কোনা উপায় নেই—অন্য কোনো—এমন কি গুজরাটি হিন্দী তামিল ইত্যাদি কাব্যেও তেমন কিছু আলো আছে কিনা ভালো করে জানা নেই আমাদের। এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো কৌতূহলও বোধ না করার জন্য আমাদের শিক্ষা খানিকটা দায়ী, কিন্তু বাংলার সঙ্গে-সঙ্গে একমাত্র ইংরেজি শিখেছি বলে সাহিত্যের দিক দিয়েও সেটা অপশিক্ষা হয়েছে বলে মনে করতে পারি না; ইংরেজি কম শিখে হিন্দী তামিল গুজরাটি বেশি শিখলে সাহিত্যিক লাভ, আমি বোধ করছি, কম হত। আমাদের সাহিত্যরচনা বেশি দেশজ (ভারতীয়) হত ঠিক, কিন্তু পরিসর তার কমে যেত ঢের; সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক ভূমি উচ্ছিষ্ট হয়েছে, এদেশের মধ্যযুগের সাহিত্যেও; উচ্ছিষ্ট করবার মতো বিশেষ কিছু অবশেষ থাকত না আর আধুনিকদের জন্যে; পরিসরভূমি বেড়ে না গিয়ে এরকম নিঃশেষিত হতে থাকলে সাহিত্যে গভীরস্পর্শিতাও নষ্ট হতে থাকে। তামিল গুজরাটি ইত্যাদি সাহিত্যে কি আছে না-আছে এ সম্বন্ধে অকৌতূহলের আর একটা কারণ এই যে এসব সাহিত্যের ভালো, নির্ভর করবার মতো অনুবাদ কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। সে রকম অনুবাদ আছে? হয়তো এক-আধটি আছে; ভালোভাবে প্রচারিত নয়; খুব সম্ভব ইংরেজিতে। এই সব কারণেই আমাদের ধারণা হয়েছে যে গুজরাটি তামিল এমন কি হিন্দী সাহিত্যও কৃশ—হয়তো তপঃকৃশ—ইংরেজি কাব্যের বড় আকাশের পাশাপাশি; বাংলায় হিন্দী গুজরাটির চেয়ে বেশি জিনিস আছে—দেশীয় জিনিসও; সংস্কৃতে ওগুলোর চেয়ে বেশি ভারতীয় ও সর্বভূমির জিনিস আছে। বাংলা সাহিত্যে যা নেই অথবা শীর্ণভাবে রয়েছে সেই সব প্রাণ ও পরিসরের থেকে রশ্মি পেতে হলে ইউরোপীয় সাহিত্য ছাড়া আমাদের অন্য কোনো আলোভূমি নেই।

সমালোচক ও কবিকে অনেকখানি সাহিত্য পড়বার কথা শোনানো হল বটে। এর চেয়ে বেশি কিছু পড়া প্রায় অসম্ভব; আমাদের দেশে অধ্যয়নের বিস্তার কম বলেই মনে হয় অনেক স্থলেই বেশি কম। কিন্তু এ-যুগ বা সে-যুগের প্রসাদের সনির্বন্ধতা থেকে যতদূর সম্ভব উদ্ধার করে কবিতাকে

আরো স্পষ্ট স্বরূপে দেখতে হলে এক-আধটি দেশের অল্পস্বল্প কাব্য পড়ে তৈরি হতে ব্যর্থ হবারই সম্ভাবনা। ঢের বেশি কবিতা পড়া চাই। ধরে-ধরে এ-কবির সে-কবির কাব্যগ্রন্থগুলো না পড়তে পারলে নানারকম প্রামাণ্য সংকলনের ভিতর দিয়ে দু-চারটে দেশের বিশেষ বয়ঃপ্রাপ্ত সব কাব্যের ভিতরে স্বভাবতই প্রবেশ—এমন কি বাস করবার ক্ষমতা লাভ করলে ভালো হয়। কবিতার সৎ পাঠক ও বড় আলোচক তৈরি হয় বটে, কিন্তু কতকগুলো গুণের স্বভাব ভিত্তি না থাকলে তাকে তৈরি করা কঠিন। যে কোনো সাধারণ বুদ্ধিমান পাঠক বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় অবশ্য, কিন্তু তাদের অনেকেই যথেষ্ট কবিতা পড়েও কাব্যের ঠিক স্বাদ পায় না, আলোচনার মর্মে গিয়ে পৌঁছতে পারে না। কেউ কেউ পারে। তাদের মনের বিশেষত্ব আছে স্বীকার করতে হবে; অনেক বেশি কবিতা পড়বার আগেই তারা বুঝতে পেরেছে পৃথিবীর সমগ্র কবিতার অক্ষর স্বাদ ছাড়াও প্রতিটি কবিতার নিজের পৃথক স্বাদ কি; কমেই আরো কবিতা পড়ে টের পেয়েছে যে নিখিলকবিতার স্বাদ ও ধারণা কোনো বিশেষ মন্ত্রের মতো একটি মাত্র নির্দিষ্ট ফল দিয়ে শেষ হয় না, অনেক বেশি দেয়; ঢের গভীরতার স্তর স্পর্শ করে। একই কাজ করে কোনো শতক বা দশকের কবিতা স্বভাবতই ছোট স্থিতির ভিতর। এই ভাবে কবিতা সম্বন্ধে ধারণার চলাচল আচ্ছন্নতা কাটিয়ে স্থিরতর হতে থাকলে কাব্যের স্বাদও ক্রমেই স্পষ্টতা লাভ করে; কবিতার দেশ, সময়, মানে (শব্দের বা বাক্যের অর্থ শুধু নয়) বুঝতে পারা যায় ক্রমেই প্রকাশিত হয়ে চলেছে এই সব পাঠক ও আলোচকদের মনে। ভালো কবিতা এরা প্রায়ই চিনে নিতে পারে। কিন্তু কোন সৎকাব্যে কি দোষ রয়েছে সেটা তত সহজে বার করতে পারে না। এ যুগে এ রকম কবিতা লেখা হল কেন, কিম্বা আর এক কালে বা দেশে আর এক রকম; কোনো এক দশকের কবিতার পাঠকেরা ঠিক এ রকম মন নিয়ে কবিতা পড়ছে কেন, বদলে যাচ্ছে মনোভাব—সমালোচকদের কাব্যমীমাংসা পর্যন্ত এক শতক থেকে আর এক শতকে, তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে, খুব দ্রুতভাবে যখন বদলায় তখন এক দুই দশকের ভিতরেই; সাময়িক

সমাজের ভাব ও বিচার-রশ্মির প্রতিফলিত পদার্থই কি কবিতা এবং পাঠক ও সমালোচকের কবিতা-জিজ্ঞাসা—কবিতায় এর চেয়ে স্থায়ী কি কিছু নেই; কোনো প্রতিভার হাতেও সে রকম সনাতন রচনা হয়তো সম্ভব নয়—এই সব প্রশ্নের খানিকটা স্পষ্ট ও সমালোচকের নিজের কাল পেরিয়ে বেশ খানিকটা বড় কালের তৃপ্তি ও পরিসরসাপেক্ষ উত্তর পেতে হলে সমালোচককে মনের প্রাথমিক স্বভাব থেকে ক্রমে-ক্রমে উপরের সব স্তরভূমিতে উঠে যেতে হবে। এ জন্যে নিজ ভাষার সঙ্গে আর একটি ভাষা—ধরা যাক ফরাসী—কিংবা এ দেশীয়দের পক্ষে ঠিক হবে ইংরেজি—ইংরেজি কাব্যের প্রতিটি শতকের অনেকখানি, খাঁটি কবিতাসংগ্রহ পড়ে দেখলে আমার মনে হয়, সুবিধা হবে সমালোচকের।

অনেক কবিতা পড়েও নিজেকে একটা বিস্তারিত তালিকার ধারক বানানো যায় শুধু। কিন্তু নিজের যুগে বাস করেও আরো অনেক যুগে বাস করবার খানিকটা স্বভাবক্ষমতা, নিজের সমাজের পুরোপুরি জীব হয়েও অন্য অনেক সমাজে নিজেকে যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দে স্থিত ও মিলিত করে নেবার মতো অনুভূতি ও বিচারের স্পষ্টতা না থাকলে নানা দেশ ও সময়ের কবিতাপাঠে বিশেষ কোনো ফল হয় না; অনেক বই পড়ে কোনো লাভ হয় না এ ধরনের কবিতা-আলোচকের। কিন্তু যে সব আলোচকের অনুভাব আছে, জ্ঞান আছে তাঁরা যদি শুধু নিজের দেশের খানিকটা সময়ের—ধরা যাক দু-তিন শতকের, হয়তো বৈষ্ণব কালের কিংবা আঠারো উনিশ শতকের—কবিতা পড়ে কৌতূহল শেষ হয়েছে ভেবে আলোচনা আরম্ভ করে দেন তাহলে আমাদের দেশেরও আধুনিক কবিতা সম্পর্কে তাঁর সত্য কথা শুদ্ধভাবে বলতে পারবেন মনে হয় না; যা বলবেন ওসব কবিতায় বিশেষ কোনো পাঠ নেয়নি এমন অনেকের কাছে সেটা সত্যের মতো মনে হতে পারে, আশঙ্কা হচ্ছে আমার। সে রকম আনুমানিক সত্যে বেশি নির্ভর করে আধুনিক (আধুনিক কবিতার কথা বলছি এই জন্যে যে নতুন নতুন কবিতার যথাসম্ভব নির্ভুল যাচাইয়ে সমালোচকের শুদ্ধির ও শক্তির পরীক্ষা হয়) ইংরেজি ফরাসী বা বাংলা

কবিতা সম্বন্ধে তাঁরা প্রায়ই যে মতামত গঠন করেন—কাব্যপাঠের পরিধি ঢের বাড়িয়ে দিলে সে রকম অস্বচ্ছ আলোচনা তাঁদের হাতের সম্ভব হত?

তাহলে কবিতাই প্রথমে পড়তে হবে সমালোচককে; পৃথিবীর বিখ্যাত সব সময়ের কবিতা বুঝে ভেবে সমালোচকের সরস ও যুক্তিস্বচ্ছ মনকে আরও আয়ত আরও স্পষ্ট করে রাখবার জন্যে। আজকের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা পড়ে সাধারণ পাঠকের মনে হতে পারে কবিতার সারাৎসার এই সবের ভিতর। কিন্তু অব্যবহিত আগের যুগের প্রধান কবিতাগুলোর সঙ্গে এ কাব্যের সম্পূর্ণ মিল নেই—সে কবিতা বা সাধারণত কাব্য সম্বন্ধেই তখনকার বড় সমালোচকদের মীমাংসাও আজকের কবিতার আজকের সমালোচকের সিদ্ধান্তের চেয়ে খানিকটা অন্যরকম। কবিতার প্রকাশ পরিবর্তিত হচ্ছে, কাব্য সম্বন্ধে পর পর সমাজ ও সমালোচকদের মতামত বদলাচ্ছে। এদেশে ওদেশের কবিতা পড়ে প্রথমটা, দ্বিতীয়টারও অনেকখানি, টের পাবেন সমালোচক; দ্বিতীয় জিনিসটা ভালো করে বুঝতে হলে সেই সেই যুগের সমাজ ও কাব্য সম্বন্ধে নির্মল, সমীচীন লেখা পড়ে দেখতে হবে; 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইখানি পড়ে দেখলে সে যুগের উপলব্ধি অভাব সাধনা সংকল্পর চেহারা চিনতে পারা যায় কিছু কিছু, ফলে তখনকার কাব্যের খানিকটা (সবটা নিশ্চয় নয়) কৌণিকতা আলোয় প্রতিফলিত হয়ে উঠবে সমালোচকের চোখে, ক্রমে আরও আলো পাওয়া যাবে, আশা করা যায়, তখনকার সমগ্র কাব্য সম্বন্ধে।

কবিতায় চিরপদার্থ আছে—সমালোচনাও। কিন্তু এক একটি যুগে সেই পদার্থের বিশেষ কতকগুলো স্পষ্টতার দিকে—লোকসেবা অথবা সমাজধ্যান অথবা সরসতার দিকে—ঝোঁক পড়ে বেশি। কাজেই কোনো কোনো কালে রসাত্মক বাক্যকে কবিতা বলে স্থির করা হয়, কোনো সময়ে সমাজোৎসারিত বা ইতিহাসবেদী অনুভূতির ভাষাকে; এই অনুভূতির নানা রকম ভালো মাঝারি খারাপ স্তরকেও কবিতা বলে ধার্য করা হয়। বড় সমালোচকের এ সব স্পষ্ট বুঝেও কবিতা সম্বন্ধে বেশি আত্মতুষ্টির বিপদ কোথায় মনে করিয়ে দিতে হবে—বার বার মনে করিয়ে দিতে হবে নিজের

যুগকে। অক্ষর কবিতা আছে, কিন্তু তা ব্রহ্মের মতো অব্যয় নয়, জেনে নিতে হবে। কোন যুগ কাব্যের কি জিনিসের উপর জোর দিচ্ছে, কবিতার কয়েকটা দিককেই সমস্ত দিক মনে করে তখনকার সমাজের কোনো ধরনের প্রয়োজনে কি সুবিধা পাচ্ছে, কবিত্বর নিত্যের বা অক্ষরতার দিক থেকে কতখানি নিরর্থক হয়ে পড়ছে, সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ফলিত করবার শক্তি কাব্যের কোনো একান্ত, আসল যুগেও নেই, কেননা তা থাকতে পারে না; কিন্তু সে জিনিসের কম বা বেশি প্রকাশ নিয়ে কাব্যের প্রতিটি ছোট মাঝারি বড় যুগের ইতরবিশেষ; রবীন্দ্রকাব্যে ঐ পদার্থ কম ছিল না বা ঈস্‌কাইলাস্‌ সোফোক্লেসের গ্রীক কাব্যে, অথবা দান্তের ভিতর; আরো প্রাণ প্রসারিত হয়েছিল শেকস্‌পীয়র ও এলিজাবেথানদের কাব্যে; তারপর চার শতকের কাব্য, আধুনিক কবিতা; ব্লেকের মতন একজন কবির কবিতা, রসাত্মক বাক্য বা সমাজচেতন আবেগ বললে যাঁর কাব্যের কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞাই দেওয়া হয় না; অথবা প্রতীকযানের কিংবা চেতনা-অনুচেতনার কবিতা সব; অন্য দিক দিয়ে রিল্‌কের কাব্য—ব্লেকের কবিতার চেয়ে এত বিভিন্ন, অথচ ব্লেকের মতনই একটা নতুন সম্ভাবনা—হয়তো সিদ্ধিরও উন্মেষ এইখানে, বাঙলাদেশে ব্লেক বা রিল্‌কের মতো কোনো কবি নেই, কিন্তু প্রতীকযানের ভালো কবিতা রয়েছে আধুনিক কালে; আগেকার যুগে অল্প পরিসরের ভিতর আশ্চর্য সিদ্ধি রয়েছে বৈষ্ণব কবিতায়, এর স্বদেশ সব সময়ের জন্যে বাংলাতেই এরকম কোনো ধরতাই সিদ্ধান্তের (সিদ্ধান্তটি মোটামুটি অখণ্ডনীয় মনে হচ্ছে আমার) উল্লেখ না করেও বলতে পারা যায় অন্য দেশে ভিলোঁকে দেখেছি, ডান, মেটাফিজিক্যাল কবিগোষ্ঠি, হাইনে, হোয়েল্ডেরলিনকে; (অর্থ ও পদ্ধতির দিক দিয়ে বৈষ্ণব কাব্যের সঙ্গে এ সব বা অন্য কোনো কবিতার তুলনা তেমন কিছু প্রাসঙ্গিক নয়—কিন্তু বিভিন্নতা সত্ত্বেও কবিতার উৎকর্ষের একটা বিশেষ স্তরের কথা মনে রেখে বৈষ্ণব পদাবলীর সম্পর্কে ধারণা আরো স্থির করতে গিয়ে এইসব কবিতার উল্লেখ করা গেল), কবিতার একটা দীন, অনবলীন 'গভীর'— বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া অন্য কোথাও

সম্ভব নয়;একেবারেই বিভিন্ন আর এক রকম রচনা—কোনো কোনো দেশে যাকে বলা হয় মার্কসীয় পদ্ধতিতে নির্ভুল, প্রামাণ্য কবিতা (আমি ঠিক জানি না জিনিসটি কি, কোনো সুস্পষ্ট উদাহরণ দেখিনি);আরো নানা রকম কবিতা—খুবই জ্ঞাত ও বিখ্যাত বলে উল্লেখ করা গেল না—এই সমস্ত কাব্য মিলিয়ে কবিতার চিরপদার্থের একটা মোটামুটি স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়। 'ব্রহ্মে'র মতো অব্যয় নয় অবশ্য সে জিনিস, কিন্তু তবুও তা কোনো যুগ, কাব্যের পর-পর ক্রান্তির আন্দোলন, অথবা কোনো বড় সমালোচককে— কোনো বিশেষ অব্যর্থ সমালোচককেও সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করে কোনো রকম সমাজেরই হৃদয়ে নিজের কাব্যব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত স্পষ্টতায় দেখা দেয় না কখনো—যত বেশি কবিতা পড়বেন বোধ করতে পারবেন আজকের সমালোচক। সমগ্র স্পষ্টতা দেখতে চেষ্টা করবেন তাও তিনি; যত বেশি দেখতে পারবেন—বুঝে প্রয়োগ করতে পারবেন দেশ সময়ের যথেষ্ট বিভেদের পটে রচিত কবিতায় দোষ গুণ দাবি ও সার্থতকার উপর, ততই গ্রন্থিত হয়ে উঠতে থাকবে সব যে যার স্থানে, পুনর্গ্রথিত হবে অনেক সমালোচক (অস্বচ্ছ ও প্রায়ই সাময়িক লক্ষণের নিকষে) যে সব ভুল স্থান নির্দিষ্ট করেছিল নানারকম কবিতার; সমালোচনা আশা করা যায়, বেশি সঙ্গত ও স্পষ্ট হবে।

কিন্তু আজকের স্থির ধার্য সমালোচনার সংগতি ও স্পষ্টতা কেবলই নতুনভাবে অনুচিন্তিত হয়ে প্রতিটি নতুন যুগের সমালোচনায় যে বিশেষত্বে গিয়ে দাঁড়াবে, সেখানে, আমার মনে হয়, ভিতরের কথার তত নয় যত বেশি ভাষা ও রীতির পার্থক্য দেখা যাবে। ধরা যাক ভাষা ও রীতির—আধার; কিন্তু কোনো কোনো যুগে তা আধেয়কে এমনভাবে আক্রান্ত করতে পারে (যেমন উনিশ শতকের শেষ দশকে হয়েছিল ইংলণ্ডে; ইংরেজি 'ভি' প্রভৃতি অক্ষরের বিশেষ অর্থশক্তি আছে মনে করা হয়েছিল; অন্যত্র, লেখা সাহিত্যের চেয়ে অলিখিত শাদা পাতার মর্যাদা বেশি মনে হয়েছিল; কিংবা ফ্রান্সে ও অন্যান্য জায়গায় প্রতীকী ও বিভিন্ন পদ্ধতি ও যানের উচ্ছৃঙ্খলতার মুহূর্তে;অথবা আমাদের দেশে গদ্য-কবিতার দাবি

নানা রকম অদেয় জিনিস চাইছিল যখন খানিকটা রবীন্দ্রনাথেরও সমর্থনে; অথবা আজকে—মার্কসীয় বিচারে কবিতা শুদ্ধ হল কিনা কোথাও-কোথাও তার আশ্চর্য আতিশয্যের ভিতরে) যে মনে হবে আধেয়—কবিতা ও সমালোচনার বিশেষ স্বরূপেই—যেন বদলে গেছে। ভবিষ্যতে কোনো-কোনো বিশেষ চাঞ্চল্যের যুগে এ আচ্ছন্নতা আরো বেড়ে যেতে পারে, কিন্তু মানুষের নিজেরই স্বরূপের তেমন পরিবর্তন না হলে কবিতা বা তার আলোচনার অর্থ কি করে অন্য উপায়ে বদলে যাবে। রুচি ও পদ্ধতির নানা রকম অতিরিক্ত অব্যাহতির দিনে বদলে গেছে মনে হতে পারে; কিন্তু অভিজ্ঞ কবি ও সমালোচকেরও মন খুব স্থির নয় তখন, প্রায় পাঠকেরই আগেকার কবিতায় অরুচি (অশ্রদ্ধা) এসেছে, প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক ও মহৎ কবিতা পরে আস্তে-আস্তে জন্ম নেবে; কবিতার আর একটি নতুন যুগ স্বাভাবিকতায় ও সমস্ত স্পষ্টতায়—ক্রমে ক্রমে দেখা দেবে।

১৩৫৬

সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা

অনেক কাল ধরেই মানুষের মনে কতকগুলো বিশ্বাস ছিল। মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে আত্মা আছে, ব্রহ্ম বা তার কোনো না কোনো রকম প্রকাশ আছে; নচিকেতা যে রকম ভাবে ধর্মের নিজের ভবনে ঢুকে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিল সে জিনিসও সম্ভব হয়, বিশ্বাস করত এক সময় মানুষ; উপনিষদ সেটা অবিশ্বাস করত কিনা জানি না; উপনিষদের রূপকের দরকার ছিল, কিন্তু রূপকের গল্পে সাধারণ মানুষের অনিমেষ বিশ্বাসকে খণ্ডন করবার কোনো কথা ছিল না উপনিষদের দিক থেকে। অনেক পরে সাধারণ জনতান্তরেও অনেকের ধারণা হল ও রকম ভাবে ও জিনিস ঠিক সম্ভব হয় না, নচিকেতার ধর্মের মতো পরলোকের কোনো মূর্তিমান অধীশও নেই খুব সম্ভব। কিন্তু তবুও পরলোক আছে, আত্মা আছে, মানুষের ব্যক্তিক আত্মারও মৃত্যু নেই, ধর্ম আছেন এবং ব্রহ্ম (পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষের কাছে ব্রহ্মের আভাস নিরেট আবছা মিহি নানা ধরনে স্থির করা হয়েছে অবিশ্যি); এই সব বিশ্বাস ছিল মানুষের—আত্মিক ব্যাপার সম্পর্কে। রাষ্ট্রিক সামাজিক ইত্যাদি দায়িত্বের ব্যাপারেও নানা রকম ধারণা চলে আসছিল, সেগুলোকে সত্য মনে করা হত। প্রতি যুগেই অবিশ্যি চলতি সত্যের যাচাই হয়েছে—মাঝে মাঝে বিশদ ভাবে—ধরতাই জিনিসের অতলে প্রবেশ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু চেনাজানা তথ্যে ও মর্মে মানুষের বিশ্বাসের ভিত নড়েনি তেমন কিছু। কিছুকাল হল অনেকখানি নড়েছে মনে হয়। এখন ব্রহ্ম না থাকার মতো, আত্মা অমর নয়, আত্মা খুব সম্ভব নেই, প্রায় কোনা রকম ইন্দ্রজাল বা কোনো অলোকসাধ্য ব্যাপারে বিশ্বাস নেই। পুরোনো বিশ্বাসগুলো—সমাজের কয়েকটা স্তরে—প্রায় কিছুই নেই। কিন্তু সে জায়গায় যে সব ফাঁকা থেকে যাচ্ছিল—ভরে আসছে আস্তে-আস্তে। বিজ্ঞানের রীতিতে বিশ্বাস

বাড়ছে—এবং এই রীতি যা দান করে তার ফলে। এক সময় ব্রহ্ম ও পরজগতে বিশ্বাসের একটা প্রসাদ ও প্রবাহের গভীরতা ছিল মনীষীদের মনে। সমাজের প্রায় সব ভূমিতেই সাধারণদের মনে এ বিশ্বাসের অত্যুচ্ছ্বাস কাজ করে গেছে। বিজ্ঞানের রীতি ও ফলাফলে বিশ্বাস—অনেকটা আত্মসমর্পণের মাত্রায়—দেখা যায় আজকাল বিজ্ঞানীদের ভিতরে—ফলিত বিজ্ঞান চারদিকেই খুব বিশেষ ভাবে উৎকর্ষ দেখাচ্ছে বলে। অবিশ্যি এই রীতি ও ফলাফলের অব্যর্থতায় সর্বসাধারণের এখনো সে রকম কিছু বিশ্বাস জন্মেছে বলে বোধ হয় না। ক্রমেই হবে আশা করা যায়; যদি হয়, যুক্তিস্বচ্ছতার কাছে সে বিশ্বাস কতখানি শুদ্ধ থাকতে পারবে বলা যায় না। কোনো জিনিস বিশ্বাসে পরিণত হলে সাধারণের ব্যবহারে তার যুক্তিশুদ্ধতা কমে যেতে থাকে বিশ্বাসের আবেগময় ব্যবহার বাড়ছে বলে। প্রথমে সত্য, পরে সেই সত্যে বিশ্বাস, তারপরে বিশ্বাসের আবেগময় ব্যবহার, জিনিসটা বিশুদ্ধ সত্যের থেকে অনেক দূরে সরে গেল। আজকালই অনেক বিজ্ঞানের-সত্যে 'খাঁটি' বিশ্বাস—পরে সেই বিশ্বাসের আবেগঘনিল ব্যবহার দেখা যাচ্ছে।

গত তিন-চার হাজার বছর মানুষের সভ্যতায় দর্শন কাজ করে গেছে; এইবারে বিজ্ঞান কাজ করবে বলে মনে হয়। কাজেই রাষ্ট্রে ও সমাজে পর-পর কয়েকটি বিপ্লব দেখা দেবার কথা। বিপ্লব যে রক্তাক্ত হবে ও দুর্ধর্ষ ভাবে নিষ্ঠুর, এমন কথা আমি বলছি না। কিন্তু মানুষের তিন-চার হাজার বছরের ভাবনা-ধারণার অভ্যাস সরিয়ে দিয়ে সে জায়গায় নতুন সত্যে দীক্ষা-শিক্ষা বসাতে গেলে সে বিপ্লব খুব ছোট বা সোজা বা দু-একটা বিষম বিলোড়নে মাত্র যে তার শেষ, সে কথা মনে করতে পারা যায় না। বিপ্লব অবিশ্যি শান্ত ভাবেও হতে পারে—অনেকখানি সময় লাগিয়ে ছোট-মাঝারি কিস্তিতে; বহু শত বৎসর পরে যোগফলে মহাবিপ্লবের চেহারাটা অনুমান করা যাবে। বড় বিপ্লব দিয়েই শুরু হতে পারে—ততটা শান্ত ভাবে নয়—বেশি মানবীয় সময় খরচ করে নয়। যে সভ্যতা দর্শনের আঁধার-খননে আবদ্ধ হয়ে ছিল এত কাল, তাকে যুক্তির

পথে চালিয়ে নিয়ে ক্রমেই আলোকিত করে তোলবার জন্যে—পৃথিবীর সকলেরই নিঃশ্রেয়সের জন্যে—এই বিপ্লব। অনেকেই এই রকম কথা বলছে। কিন্তু বিপ্লব আসেনি এখনো। আমরা যে সময়ে বাস করছি দু-দুটো যুদ্ধে ও নানা রকম বড় অনর্থে অত্যাচারে তা ভেঙে ধবসে যেতে থাকলেও জীবনের সব কাজই যুক্তিসফলতায় দাঁড় করাতে হলে যে ধরনের সমাজনমনীয়তার প্রয়োজন—সৎ শক্তির শান্ত বা অশান্ত প্রয়োগে—সে রকম বিপ্লব পৃথিবীর কোনো-কোনো জায়গায় এক আধটা ঘটে থাকলেও তারাও খুব ভালো করে শেষ রক্ষা করতে পারেনি; পৃথিবীর বাকি বড় জায়গাটায় কোথাও তেমন কোনো বিপ্লব হয়নি। আমরা এখনো কোনো বিপ্লবের যুগে বাস করছি না, আমাদের সন্ততিরা করবে বলে মনে করছি। স্পষ্টতর সত্যকে গ্রহণ করবার কথা উঠলে আমাদের দেশ কাল, দেখছি তো, এখনো পিছিয়ে থেকে পরিচিত অস্বচ্ছ অভ্যাসে শান্তি পাচ্ছে। মানুষের জীবন সম্পর্কে কতকগুলো নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তের চলাচলে সমাজ অনেকখানি আড়ষ্ট হয়ে আছে এখনো। সে সব সিদ্ধান্তে বিশ্বাস অবিশ্যি ক্রমে-ক্রমে শিথিল হয়ে পড়ছে। পুরোনো মতে ও মীমাংসায় আস্থা মরে যেতে সময় নেয়; নতুন সত্যে—মানে, সত্যের নির্মলতর মর্মে—বিশ্বাসও খুব ধীরে-ধীরে আসে জীবনে। বিপ্লব সমাজকে ধাতুপদার্থের মতো খানিকটা গালিয়ে ফেলে বটে, কিন্তু নতুন প্রকৃতিতে গঠিত হবার আগে সে ধাতু কঠিন হয়ে তার পুরোনো মাতৃআকৃতির সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকতে পারে আবার; থাকতেই চায় যেন। এ জিনিস রাশিয়ায় দেখা যাচ্ছে বলে আমার ধারণা; আগে ফ্রান্সে দেখা গেছে। বিপ্লব মানে শুভার্থে বিপ্লব ধরে নিয়েছি আমি। বেশ ঘন সন্নিপাতের দরকার বিপ্লবের, সমাজকে অনেকখানি পরিবর্তিত করে কল্যাণের বেশি আলো দান করতে হলে। বিপ্লব সম্পর্কে আজ এই পর্যন্ত। পরে অন্য কথা বলবার অবসর আসতে পারে। ভাববার অবসর অবিশ্যি সব সময়েই আছে মানুষের মনে।

কিন্তু বিপ্লবের চাপে রূঢ় সমাজকে ক্রমেই আরো নমনীয় নতুন ও সৎ করে তোলবার শক্তির কথা বলতে গিয়ে এক-আধটা ফাঁক থেকে গেল। চার

হাজার বছরেও মানুষের মন বদলাল না। খারাপ হয়েছে কেউ-কেউ বলছে। যত দূর মনে হয়, মোটের উপর খারাপ হয়নি, কিন্তু বেশি সততার দিকে হৃদয়ের মোড় ঘোরেনি। এ রকম অবস্থায় সমাজের ভালো কি তার উপর আরোপিত হবে না—না, মানুষের মন ভালো হচ্ছে বলে সমাজ ভালো হবে? শুভ সব বিপ্লব যদি আশা মিটিয়ে সফলও হয় তাহলেও, আমার মনে হয়, আরো অনেক কাল (সমস্ত কাল?) সমাজের ভালো বড় জোর আরোপিত হবে সমাজের উপর সৎ বিপ্লবের ফলে, মানুষের হৃদয় ভালো হবে বলে সমাজ ভালো হবে মনে হয় না। মানুষের কি দরকার—কিসে চরিতার্থতা ও স্বস্তি? ব্যক্তির স্বাধীনতা—না সমাজ নিজে স্বাধীন ও সৎ থেকে অন্তর্গত অধীনকে সমাজের অনুচিন্তিত মঙ্গল দান করতে থাকবে—সেই জিনিস কৃতার্থ করে? আজকাল যারা মানুষের কল্যাণের দিকে বিশেষ ভাবে মন দিয়েছে তাদের ভিতরে অনেকেই মনে করে সৎ সমাজের ভাবিত মঙ্গল ছাড়া ব্যক্তির নিজের মাথায় কোনো মঙ্গল নেই; এ ছাড়া ব্যক্তি কি হিসেবে স্বাধীন হবে, সে রকম কোনো স্বাধীনতা নেই ব্যক্তির। এ সমস্যা এ ভাবে মেটানো সহজ হতে পারে, কিন্তু কত দূর সত্য, ব্যাক্তিকে কতটা কি রকম স্বাধীনতা দেওয়া বিজ্ঞানী সত্য—কিংবা ব্যক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানী সত্য ছাড়া অন্য কোনো সত্য আছে কিনা এ সব ভেবে দেখতে হয়। যত দূর বুঝেছি তাতে মনে হয় সত্যকে তার সব চেয়ে সাধারণ লোক-মঙ্গলের ক্ষেত্রেও ঠিক ভাবে ধরতে পারা যাচ্ছে না; দর্শন একদিন এটা পারেনি, বিজ্ঞানও পেরে উঠছে না আজ; তবে দর্শনের চেয়ে গণস্পষ্ট পৃথিবীর দরকারে শুভ সত্যকে বিজ্ঞান বেশি আয়ত্ত করতে পারবে বলে মনে হয়। সম্প্রতি নানা দিক দিয়ে ঘুর-পথে অসার পথে চলেছে বটে বিজ্ঞান; কিন্তু সেটা বিজ্ঞানের নিজ স্বভাবের—যত দূর পর্যন্ত তা প্রতিভাত হচ্ছে আমার চোখে—নিজ স্বভাবের দোষে নয়; বিজ্ঞানকে যারা ব্যক্ত করছে দোষ তাদের কম পরিমাণে নয়। আগে যেখানে যাদুমন্ত্র কাজ করত, পরে সহজ যুক্তি ও সংস্কার, সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে বিজ্ঞান এখন; রাষ্ট্রের দরকারে বিজ্ঞান আজ প্রায় সেই সব পূর্বজ যাদুর মতনই অব্যর্থ বিবেচিত হয়ে তার

পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বেশি; বিজ্ঞানের সহায়তায় এই পৃথিবীতেই কেমন একটা অনন্দার সৃষ্টি করছে যেন, শুদ্ধ বিজ্ঞান শুষে ফলিত বিজ্ঞানকে ভিয়েনে চড়িয়ে ব্যুৎপত্তিকেই জ্ঞান মনে করে আজকের এই সব ব্যস্ত বিপদগ্রস্ত শিক্ষিতেরা। কিন্তু তবুও বিজ্ঞানের নিজ স্বভাবে এ সব দোষ না থাকলেও স্থান সময় সমাজ সম্পর্কে কেবল নির্ভুল সত্য বার করে (এবং যেখানে অনুভব করা ছাড়া উপায় নেই সে স্থলে অনুভব করে) মানুষের উন্নতি কল্যাণের কাজে লাগাবার প্রতিভা কত দূর রয়েছে বিজ্ঞানের—আমাদের বাস্তবগোচর জগতের—তিনটি-বিস্তারের স্পষ্ট-যুক্তির? বিজ্ঞান বলতে আজ পর্যন্ত যা বোঝায় সে পথ ছাড়া অন্য পথে প্রতিবিম্বিত সত্য কি নেই? কবিতা—ভালো কবিতা বা, মহৎ কবিতা—কোনো স্পষ্ট, বিজ্ঞান-প্রামাণ্য পথে রচিত হয় বলে আমার মনে হয় না! কোনো কোনো কবিতা কি ভাবে রচিত হয়েছে তার একটা বিজ্ঞানস্বচ্ছ বিশ্লেষণ বা কি ভাবে রচিত হতে পারে তার একটা অনুরূপ স্বচ্ছ প্রস্তাবনা কিছু পরিমাণে সম্ভব বটে। কিন্তু একে কাব্যের এঞ্জিনিয়ারিং বলে না। কোনো এঞ্জিনিয়ারিং নেই। নানা রকম উপকরণ রয়ে গেছে পৃথিবীতে ও ব্রহ্মাণ্ডে। কবিতা লেখবার সময় অনেকেই এসে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তবুও ঠিক কটি দরকারী উপকরণ আস্তে-আস্তে সঞ্জাত হয় কবির হৃদয়ে। কি করে—কেন—মনোবিজ্ঞানে এর সদুত্তর দিতে কেউ চেষ্টা করেছে কিনা জানি না, কিন্তু কোনো অন্তিম, স্পষ্ট উত্তর আছে বলে মনে হয় না। ল্যাবরেটরিতে অবিশ্যি জীবন তৈরি হতে পারে একদিন, তারপর মন, তারপর কবিমন, স্বাধীন, মিশেল, জটিল মন সব; তখন একটা পরিষ্কার উত্তর পাওয়া যাবে আশা করি; কিন্তু জীবনই তো তৈরি হয়নি আজো; হবে কোনো দিন? সব জাতীয় কবিতা লেখবার সময়ই অবশ্য-উপকরণগুলো একই সমষ্টি ও সংমিশ্রণের উনিশ-বিশ—সমবায়েরও। কাব্য সৃষ্টির সময় বিজ্ঞান ও দর্শন নিজেদের মোটামুটি সত্যে আছে কবির হৃদয়ে, সেখান থেকে কাব্যের সত্যে একটা তারণ স্পর্শের ফলে ক্রমেই উত্তীর্ণ হচ্ছে। কবিতা লেখবার সময় বোঝা যায় হৃদয় কেমন মিতব্যয়ী কবির—

প্রয়োজনীয় ছাড়া বাকি সব উপলব্ধির আকর; কিন্তু নীতিমাফিক বিজ্ঞান নয়; রাদারফোর্ড বা প্লাঙ্কের মতো নিরেট এক সজাগ চেতনা-স্বামীর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে উপাদানগুলো কবি ডেকে আনছে না তার হৃদয়ে। একটা স্থির, ক্রমিক অব্যর্থতার বশে কোনো একটি বিশেষ কবিতা রচিত হবার সময় আবির্ভাব হতে থাকে নানা উপকরণের ভিতর থেকে কবির প্রয়োজনীয় ঠিক কয়েকটি উপকরণের। কবির চেতনা খুব ভালো, কিন্তু তাঁর বিজ্ঞানী চিত্ত দিয়ে কিছু হবে না (নিজের কবিতা লেখা হলে কবিতাটিকে প্রয়োজনীয় গদ্যে বিশ্লেষণ করতে পারবে হয়তো সেই চিত্ত), এই কবির এই রকম বিশেষ অভিজ্ঞতা ও ভাবনা-প্রতিভার আধারে আমাদের ঠিক এ রকম ভাবে উত্তীর্ণ ও উপজাত হওয়া উচিত—বলে চলেছে যেন কবির হৃদয়ের ভিতরে উপাদানগুলো কবির সহায়তায় লালিত হয়ে—বিনিময়ে কবিকে কি এক নিশ্চিত, নিরপেক্ষ সহায়তা দান করতে-করতে। একটি কবিতা তৈরি হল এ ভাবে। তৈরির প্রণালীর সম্বন্ধে যা বোঝা গেল এক-আধ কথায় বলতে চেষ্টা করেছি। কবিতার সত্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবার মতো প্রায় অনুরূপ রীতিতে বিজ্ঞানের সত্য মাঝে-মাঝে মনের ভিতর চকিত হয়ে ওঠে বিজ্ঞানীর। কিন্তু তাকে প্রতিষ্ঠিত করা একটা গাণিতিক যুক্তির স্পষ্ট তা সাপেক্ষ। কিন্তু এ রকম কোনো প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার গণিত তাতে নেই বলে যে কবিতাটি সৃষ্ট হল তাকে অসত্য বলতে পারা যাবে না। কবিতাটিকে প্রমাণ করার জন্য কোনো গাণিতিক যুক্তি নেই—গ্রহণ করবার জন্যে মানুষের মন বা হৃদয় রয়েছে; গণিতের ধাপের অনির্বচনীয় স্পষ্টতার থেকে হৃদয়ের উৎপত্তি হয় না; সত্য সব সময়ই (এবং সকল ধরনের প্রকাশেই) ঠিক একই রকম নয় বলে তার আধারের পরিমিতি ও বিভিন্নতা—গণিতে (বিজ্ঞানে) এবং কবিতায়; কেউ কারো চেয়ে বেশি অসত্য নয় কবিতার সত্য গণিতের মতো অব্যর্থ—স্বাদের সমস্ত পার্থক্যের ভিতর দিয়ে। স্বভাবতই যারা ঢুকে পড়ে স্বাদ পাচ্ছে গণিতের পৃথিবীতে, তারা কবিতারসিকদের চেয়ে বেশি আস্বাদ পাচ্ছে কিনা সে মীমাংসার স্থান আমার এ প্রবন্ধে নেই—আমার মনেও নেই; কবিতার স্বাদ

গণিত বা বিজ্ঞানচর্চার আস্বাদের চেয়ে অন্য রকম। কবিতায় যে সত্য ও তারই নমনীয় অথচ একক স্পষ্টতা ফলেছে কবি সেটা অনুমান তর্কের ছকে কেটে ততটা লাভ করেছেন বলে মনে হয় না, কিছুটা হয়তো করতে পারেন। বস্তুরাশি সম্পর্কে মাঝে-মাঝে একটা আশ্চর্য অন্তশ্চক্ষু. বিজ্ঞানীকে সত্য আবিষ্কারের দিকে এগিয়ে দেয়; ঠিক 'বৈজ্ঞানিক' উপায় কাজ করছে না এখানে, প্রণালীটা অন্য রকম। সত্য নির্ধারণের সমস্ত প্রণালী ও সব সত্যকেই বৈজ্ঞানিক বলা যেতে পারে যাতে সেই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের অর্থ ও পরিসর বাড়িয়ে দিলে সাহিত্য ও তার সৃষ্টিকৌশলকেও স্বচ্ছ গাণিতিক সত্য বলা যেতে পারে। কিন্তু কবিতা কোনোদিন এ রকম ভাবে বিজ্ঞানের স্ফীতির ভিতরে চাপা পড়ে যাবে মনে হয় না। আমরা বিজ্ঞান বলতে যা বুঝি তা আমাদের অনেক সত্য দান করে। কিন্তু তবুও আরো নানা রকম সত্য আছে যা আমরা পুরোপুরি গণিতের (বিজ্ঞানের) উপায়ে লাভ করি না। আমার মনে হয় এই শ্রেণীর সত্যের ভিতরে আজকালকার দিনে কাব্যের সত্যই সব চেয়ে নিঃসন্দেহ স্থানে আছে—সমান্তরাল স্পষ্টতায়—বিজ্ঞানের সঙ্গে; মাঝে মাঝে বেশি গভীরতায় বিজ্ঞানের থেকে। এর আগে সমাজের সাধকসাধারণের ধর্ম ও রকম স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল. তারও আগে যাদুবিদ্যা। ধর্ম এখনো দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু সত্য—নিজের এলেকার সত্যগুলোও তার বিজ্ঞানের হাতে চলে যাচ্ছে—দেখছে সে, তার সত্য ভুল? বিজ্ঞানের সমস্তই সত্য? ধর্মের নষ্ট সত্যগুলোর স্থিরতর মানে বেরুবে কি—বিজ্ঞানে খণ্ডিত না হয়ে? না সত্যই বদলে যাবে ধর্মের? অন্য এক নতুন জিনিসকে ধর্ম বলা হবে? মানুষের জীবন, মৃত্যু, তীর্ণ লোক, সৃষ্টি ও এর কর্তা—এ সবের রহস্য ভেদ করতে চায় যে ভাবনা যত দূর সম্ভব স্পষ্ট যুক্তির আশ্রয় নিয়ে—সেটা দর্শন; উপরের বাক্যে 'ভাবনা'র জায়গায় 'প্রমাণ' শব্দটি বসিয়ে দিলে মোটামুটি বিজ্ঞানের সংজ্ঞা পাওয়া যাবে; কিন্তু ধর্ম, জীবন, মৃত্যু, সৃষ্টি ও এর জনিতা প্রভৃতিকে পরিষ্কার করে তুলতে চায় সংস্কার আপ্ত বাক্য ও অনুভূতির প্রাণঘনতায়। আমি কয়েক লাইন আগে ধর্ম বলতে যা বুঝেছি সেটা এ ধর্মও বটে, কিন্তু বেশি করে এর ফলিত

ব্যবহার—পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মে। আমার মনে হয় বিশুদ্ধ ধর্মকে আয়োজন মতো আরো নিয়ন্ত্রিত ও শুদ্ধ করে নিলে তাকে কবিতার সঙ্গে প্রায় একটা বিপজ্জনক একাত্মতায় দাঁড় করানো যেতে পারে। কিন্তু সে রকম না দাঁড় করানোই ভালো। ধর্মের সেটা লক্ষ্যও নয়—রুচিও নয়। কবিতাও নিজেরই বিশেষ স্বভাবের জিনিস। তা ধর্ম নয়; আপ্ত বাক্যের কোনো স্থান নেই কবিতায়; খানিকটা এক প্রকারের হলেও কবিতায় সংস্কার ও অনুভূতির ব্যবহার ধর্মের চেয়ে মোটের উপর আলাদা রকমের। দর্শন ও ধর্মের নিকটতর ছিল কবিতা এক সময়, ধর্মের সংস্কার ও অনুভূতির কাছেই ছিল, এবং মানুষের ও নিসর্গের স্পষ্ট সত্য দর্শনের ভিতর পেত সে; এখন বিজ্ঞানের ভিতর থেকে পাচ্ছে। ধর্মের বড় প্রথমা অনুভূতির নিবিড়তা কমে যাচ্ছে, তার সংস্কারও সে রকম সহজ হিরণ জিনিস নয় এখন আর—অনুষ্ঠানে অস্পষ্ট ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। কবিতায় অনুভূতি ও সংস্কারের উৎসারী জিনিস ধর্মের চেয়ে প্রথম থেকেই খানিকটা পৃথক ছিল। যুক্তিরীতির উপায়ে শুদ্ধ হয়ে ধর্ম যদি আবার ফিরে আসে, কবিতার নিজ উৎসারীকে আত্মসাৎ করতে পারবে না, করবার কোনো কথা থাকবে না ধর্মের, অথবা ধর্মের নামে অনুপ্রাণিত কবিতার। ধর্মকে এ রকম যুক্তি দিয়ে মেড়ে শোধন করা সম্ভব কিনা—আলাদা কথা। অন্য কোনো উপায়ে শুধরে নিতে হবে? সেটা সম্ভব হলে বেশি বদলে যাবে ধর্মের রূপ; এ নামও হয়তো থাকবে না আর তখন তার। কিন্তু কবিতা ও ধর্মের ভিতটা মোটেই এক নয়—আলাদা থাকবে শেষ পর্যন্ত। আজকের পৃথিবীতে ধর্মের মৃত্যু হচ্ছে অনুভব করে একদল লোক নিজেদের নিঃসহায় মনে করছেন। কবিতার অবিশ্যি মৃত্যু হয়নি। কিন্তু যাদের অমিয় ঈশচেতনা একদিনের জিনিস নয়—ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্ম ছাড়া অন্য কোথাও আলো নেই এই আশ্বাস ও আস্থার ফলে—আজকের বিজ্ঞানে হয়তো কোনো আশ্রয় খুঁজে পাবে না তারা; এ সব লোকেদের জন্যে কবিতায়ও কোনো বিশেষ আশ্রয় নেই। ধর্ম সত্য ও শেষ সম্বলের জিনিস তার সাধকদের; এ জিনিস সরে গেলে তারপর কিছু থাকে না আর তাদের জন্য; এ জিনিসের

বিলোপের কথা ব্যক্ত হতে পারে কবিতায়, কিংবা চেনা সত্যের পরিবর্তনের বা নতুন সত্যের আবির্ভাবের—কবিতার নিজের স্বাভাবিক ভাষায়। হতে পারে; কিন্তু প্রধান ভাবেই যারা ধর্মাশ্রয়ী তাদের শূন্যতা (আজকের দিনের) ঘোচাবার মতো বিশেষ ক্ষমতা কবিতায় নেই। বিজ্ঞানে কবিতায় দর্শনে সত্য যা তাকে সব সময়ই দরকারী মনে করেছে যারা, কিন্তু বিজ্ঞান যা দিতে পারে সে সব দ্বিতীয় সত্যের পাশাপাশি প্রথম সত্য যারা অনুভব করেছে কবিতার ভিতর, যাদের মনে হয়েছে সত্যের আলো কবিতার স্বচ্ছ মানবসামান্য ভাষার গভীরতায় প্রতিফলিত হয়েছে বেশি—তারা ধর্মাশ্রয়ী থেকে থাকলেও কবিতায় আনন্দ পাবে। কবিতায় আনন্দ পাওয়া মানে আশ্রয় পাওয়া নয়, কবিতায় ধর্মের মতো কোনো শেষ, ঈশ্বরঘন আশ্রয় নেই;কবিতা আলো দান করে, পথও দেখায় বটে, কিন্তু সে সবের চেয়ে ঢের বেশি সান্ত্বনা ও সিদ্ধি—মানুষকে বীতকাম ও অশোক করে তাকে মুক্তি—দিতে পারবে বলেছিল, এবং তার নিজের পদ্ধতিতে দিয়েও এসেছে কয়েক হাজার বছর ধরে ঢের বৃহত্তম পৃথিবীর ক্ষেত্রে। ও রকম কোনো বৃহৎ ফলাফল—সকলের জন্যে—কবিতার হাতে নেই। আধুনিক মানুষের মন দর্শনের আত্মস্থতা ভেঙে যতই বিজ্ঞানে ও সাহিত্যের নির্দিষ্ট মর্মে ধাতস্থ হয়ে উঠছে—ও রকম প্রতিশ্রুতি ততই সে চায়ও না কারো কাছ থেকে। জীবনের নানা রকম ইঙ্গিত ও অর্থ সৎ কবিত্রয় রূপ পেলে অন্তিম ভাবে যুক্তিসহ হয়ে ওঠে; প্রীতি দান করে বিজ্ঞানী বা ধর্মজিজ্ঞাসু মনকেও;কবিতায় যে আনন্দ বোধ করবার সম্ভাবনা রয়েছে সে জাতীয় মনের—তার চেয়ে বেশি প্রশান্তি বড় স্থিরতা বিজ্ঞানে পাওয়া যাবে না; ধর্মে পাওয়া যেত একদিন, কিন্তু আজকাল পাওয়া যাচ্ছে না; দর্শনে কোথাও-কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল, এখন ক্রমেই বিজ্ঞানে দাঁড়াচ্ছে গিয়ে দর্শন। কতকগুলো সত্যের সব চেয়ে স্বভাব প্রকাশ বিজ্ঞান নয়, এ সিদ্ধান্ত টেঁকসই মনে হচ্ছে;নতুন সফল সব সত্যের স্বতঃসিদ্ধতায় প্রতিষ্ঠা খুব বড় বিজ্ঞানীর বিখ্যাত বইয়ের পাশাপাশি আধুনিক একটি মহাকাব্য খুলে বসলে ব্যাপারটা বুঝতে পারা যাবে।

এ প্রবন্ধের আর এক জায়গায় আমি বলেছি যে আমাদের সময়ে না হলেও—খুব বেশি দেরিতে নয়—বিপ্লব আসবে; দীর্ঘকাল ধরে সক্রিয় থাকবে বলে মনে হয়, স্বৈরী দর্শনকে অনেকখানি সরিয়ে দিয়ে (সব সময়ের জন্যে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় অবিশ্যি)—মানুষের ভাবনা-চেতনার দেশে বিজ্ঞানকে স্থাপন করবার জন্যে—যাতে যুক্তিপ্রাণ হয়ে উঠতে পারে সমাজ—সকলের মঙ্গলও সম্ভব হয়। এ ছাড়া অন্য কোনো ধরনের বিপ্লবের বিশেষ কোনো অর্থ হয় না আজ কাল আর। মানুষ অবিশ্যি কোনো রকম পরিপ্রেক্ষিতের দাস ঠিক নয়; তার সম্বন্ধে যা আশা করা যাচ্ছে সেটা উৎসন্ন করে দেবার শক্তি মানুষের যে নেই তা নয়। মানুষ উৎসন্নও হয়ে যেতে পারে—খুব বিশৃঙ্খল বিপ্লবে। কিন্তু বিশেষ ভালো প্রেরণায়ও নির্ভর করে বিপ্লব যদি আসে তাহলে তখনকার সাহিত্য, কাব্য কি আগেকার চেয়ে সফল সপ্রতিভ হয়ে উঠবে, বেশি মহান হবে? গত এক হাজার বছরের দর্শন ও সাধনসংকল্পে অবিশ্বাস, নতুন বিজ্ঞান ও সংকল্পের ভূমিতে বিশ্বাস—কবিদের চেতনার দেশে এই দু'রকম টানের মর্মান্তিক উপলব্ধি হবে বিপ্লবের দান ও কবিতার প্রেরণা। পুরোনো সত্যে ও মর্মে অতটা অবিশ্বাস ঠিক হবে না, নতুন সত্যে ও বিশ্বাসের আতিশয্য বিপ্লবের তাপে বেড়ে উঠে অর্ধ-সত্যের চেয়ে বেশি কিছু হতে পারবে না। প্রায়ই তা যে হতে পারে না ফরাসী বিপ্লবের সময় দেখা গেছে—পরে রুশ বিপ্লবের সময়। আজকাল 'বিপ্লবমাতৃক' সোভিয়েট একটা নতুন বিশ্বাসের সূর্যজ্বালায় এত বেশি আলোকিত যে ঠিক সেই বলয়ের বাইরে আর সমস্ত সাহিত্যকেই দুর্বোধ্য সান্ধ্যভাষা মনে হয় তার; 'যদি হায়নারা আর নেকড়েরা কলম নিয়ে লিখতে পারত' মনে হয়। এ রকম অত্যুচ্ছ্বাস বড় জোর সুসাহিত্যিক দল বেঁধে তৈরি হতে পারে, কিন্তু বৃহৎ, মহান সাহিত্য তৈরি হওয়া কঠিন। নিজেদের প্রণালী ও সিদ্ধান্তে সোভিয়েটের অতি বেশি জোর বিশ্বাসের পাল্টা অবিশ্বাসের অসীম ঝাঁঝ, আমার মনে হয় পশ্চিম ইউরোপে এখনও দেখা দেয়নি। দেখা দেবে কি শিগগিরই? চিত্তর বিমর্ষতা ও অনেকটা স্থিরতা আছে এখনো সেখানে। কিন্তু বিশ্বাসের আশ্চর্য কৃতবিদ্যতায় রাশিয়া আজ যে রকম দীপ্ত তাতে উচ্ছ্বাস কমিয়ে ফেলে

ধীরভাবে চেতনার গভীর অন্তর্যামী আলোয় জীবনকে চিনে নেওয়ার সাহিত্যপদ্ধতিকে বুর্জোয়ার ভূতের বেগার বলে মনে হচ্ছে তার। কিন্তু এ রকম বেগার দাস্তে খেটে গেছেন—টলস্টয়ও। আধুনিক সোভিয়েটেও যেখানে যা কিছু ভালো সাহিত্য হচ্ছে সেটা স্থিরতা, ইতিহাসে যা হয়ে গেছে সে সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান, যা হয়নি সে সব দুঃসাধ্য স্বর্গ রচিত হতে পারে স্বীকার করেও বিশ্বাসের মাত্রারক্ষা ও অভিনিবেশের ফলেই হচ্ছে।

অবিশ্বাস বা বিশ্বাসের অন্তিম আলোড়ন যে বিশৃঙ্খলা আনে তা নিয়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তৈরি হওয়া কঠিন। প্রথমটির থেকে নানা রকম আচ্ছন্ন, কৃশ লেখার জন্ম হয়—দ্বিতীয়টি তিলধারণের স্থানে ব্রহ্মাণ্ডকে ফোটাবার প্রতিভা পায়নি, কিন্তু তেমনি একটা আগ্রহের চলাচলে ও উৎসাহের অতিরক্ততায় সাহিত্যের সাধারণ সব স্তরে মাত্র সফল। বিপ্লবের সময় বিপ্লবের মন্ত্রে বিশ্বাস অন্তিম হয়ে ওঠে; সমাজ যখন মরে যাচ্ছে কিন্তু নতুন সাধনা সূচনার চিহ্ন নিয়ে বিপ্লবের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, অবিশ্বাস অন্তিম হয়ে ওঠে তখন; খুব প্রতিভাবান কবির পক্ষেও এ সব সময়ে বড় অবিনশ্বর সাহিত্য তৈরি করা কঠিন। বিশ্বাস বা তার অভাবের পরিমিত প্রসার ও গভীরতা নিয়ে কবির কাজ; তার বাইরে সে বিশেষ প্রতিভার শুভক্ষণের উপর নির্ভর না করে প্রয়াণ করতে পারে না। অতি অবিশ্বাসে অনেক আধুনিক সাহিত্যের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার চেয়েও খারাপ হবার সম্ভাবনা বিশ্বাসের বেশি সাচ্ছল্যে। কবির বিশ্বাস বা তার অভাবে অতিপ্রবণতার দোষ রয়েছে কিনা টের পাওয়া যাবে তার কবিতা পড়লে। সৎ কবিতায় মোটামুটি বোধ করতে পারা যাবে কবি নিজে কি বিশ্বাস করে না করে; কিন্তু সে কবিতায় যে সত্য (ভাষার যে স্পষ্ট স্বভাবে) ব্যক্ত হয়েছে সেইখানেই কবি নিজে অনুভব করে পাঠকের বিশ্বাসের মর্মে হাত রাখতে পেরেছে; আনুষঙ্গিক অনাস্থার অতীত কি বিশেষ আস্থা রয়েছে সেটা একজন ব্যক্তির নয়—কবির নিজের ব্যক্তিকতার নয়—সমস্ত দেশ কাল সন্ততির পরিচয় হিসাবে স্থির করতে পেরেছে।

১৩৫৬

রুচি, বিচার ও অন্যান্য কথা

উপনিষদ ও সোফোক্লেস ইস্‌কাইলাসের সময় থেকে আজ পর্যন্ত যে সমগ্র কবিতার জন্ম হয়েছে আমাদের দেশে ও পশ্চিমে—সে সবের অনেক কবিতাই ছাপার অক্ষরে টিকে থাকলেও মানুষের মন থেকে মুছে গেছে; যে সব কবিতা বেঁচে আছে তারও অনেক ক্ষয়িত হয়ে পরে ফুরিয়ে যাচ্ছে মানুষের মন থেকে। কিন্তু তবুও অনেকগুলো কবিতা আছে; আরও অনেকদিন পর্যন্ত টিকে থাকবে মনে হয়। যতদিন মানুষ তার নিজের ও চারদিককার আভাসপ্রকাশ সম্পর্কে ভেবে চলবে—ভাবনার কিনারা খুঁজে পাবে—সোজাসুজি তর্কে নয়, ভাষারও কম আয়াসে বেশি আলোকিত করবার শক্তির ভিতর—ততদিন পর্যন্ত থেকে যাবে এসব কবিতা। সব যুগই একরকম নয়। কোনো-কোনো যুগে মানুষের রুচি বুদ্ধির যথেষ্ট বিকার দেখা যায়। স্বভাবতই ভালো বলা যেতে পারে না, তবু মোটামুটি মঙ্গলপ্রেরণা আছে মানুষের। সেটা না থাকলে উপনিষদ তৈরি হতে পারত না, অথবা মহাভারত; বুদ্ধ অশোকের রাষ্ট্র, নির্মল ক্রিশ্চান উন্মেষ সম্ভব হত বলে মনে হয় না; পশ্চিমী শাসনসভ্যতার সৎ আইন-কানুন সব—বিশেষত রোমে যা হয়েছিল এবং অনেক পরে ইংলণ্ডে—সে সবের প্রণয়ন ও গ্রহণের কথাই উঠতে পারত না; ইতিহাসে যা স্থূলত দেখতে পাচ্ছি না, সেই সুসম্পন্নতা লাভ করবার জন্যে এ রকম সক্রিয় দেখা যেত না ইতিহাসকে; বর্ণমালা তৈরি হয়ে এ উৎকর্ষে পৌঁছুত কিনা সন্দেহ, পৃথিবীর নানা জাতির অক্ষরে শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয়ে বইগুলো মোটের উপর রুচি ও জ্ঞানের আকর হয়ে দাঁড়াবার জন্যে খুব সচেষ্ট দেখছি তো। সততা ও সিদ্ধিলাভের ক্ষমতা মানুষের আছে মনে হচ্ছে। কিন্তু তবুও কোনো-কোনো যুগে মানুষের ধারণা-চেতনার বিকারের ফলে অনেক জিনিস ঠিক মতন গড়ে উঠতে পারেনি, যেগুলো মোটামুটি পেরেছিল তারও ধ্বসেছে অনেক;

ভবিষ্যতেও এ রকম হবে আরো; কিন্তু তবুও বড়জাতীয় কবিতার টিকে থাকার শক্তি মানুষের মতিগতির অধঃপতনের অতীত খানিকটা। সততা ও বিশুদ্ধির প্রয়াস রয়েছে মানুষের এবং মহান কবিতা তার সহায়ক; সবচেয়ে বড় সহায়ক— এ রকম কোনো দাবি অবিশ্যি নেই আমার।

কিন্তু ব্রহ্ম সম্পর্কে যে রকম, কাব্য সম্বন্ধে মানুষের ধারণার সে রকম কোনো অব্যয় শুদ্ধতা আছে কিনা; দেখেছি ব্রহ্ম সম্বন্ধে ধারণারও তেমন কোনো অনাশ স্পষ্টতা নেই; আমাদের দেশেই এক যুগের পর আর এক যুগ যে রকম বদলেছে এবং দার্শনিকের ব্যক্তিত্ব—ব্রহ্মের স্বরূপও—সেই হিসেবে কিছু-কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। যতদূর টের পাওয়া যাচ্ছে দর্শনে এখন ব্রহ্ম নেই—পশ্চিমের দর্শনে অন্তত; সে দর্শন বিজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, আমাদের দেশে কোনো দর্শনপ্রস্থান নেই আজকাল আর, পুরোনো দর্শনের উপর মন্তব্য রয়েছে, কিংবা তার টিকাকারদের ভাষ্যে আধুনিকতার এ-আলো সে-আলো প্রতিফলিত করে বই লেখা হচ্ছে বা ক্লাসে বা এক্স্টেনশন লেকচারে ব্যক্ত হচ্ছে। তাহলে ব্রহ্মের স্বরূপও বদলাল ঢের, এবং যিনি শেষ নির্মল অজর অবস্থায় আছেন তিনি সে রকমই অক্ষর শূন্যতায় শূন্য—এই স্থিতিভিত্তিতে দাঁড়াল—মাঝখানের অনেকগুলো স্তর ভেদ করে অনেক যুগ বসে। ব্রহ্মসম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত হল খুব সম্ভব এই যে মানুষের আগেকার ধারণা অনুযায়ী সে রকম ঠিক নেই কেউ, কিন্তু দেশ কাল ও সব উপকরণ এবং সে সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞানের আলো ও অজ্ঞানের অন্ধকারকে গ্রথিত করে যা আছে তা ছাড়া অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নেই; আগেকার মনীষীরা যেখানে বলত ব্রহ্ম আছে, আজকালকার বিজ্ঞানীরা বলছে দেশ সময়ের একটা অন্ধকার ও দেদীপ্যমান বৃষ্টি রয়েছে; অঞ্জলি ভরে জল খেলে পিপাসা মিটবে, সে জলে বিষ থাকলে মৃত্যু হবে, এগুলো যেমন মানুষের মন ও দেশ কালের মুখাপেক্ষী সত্য সেই রকম সত্য। আজকের যুগ এই কথা বলছে, পরের যুগগুলো কি বলবে এখনই ধারণা করে নিতে পারা যায় না; তবে অন্য ভাবে দেখবে স্বরূপকে, ভিন্ন কথা বলবে, এটা ঠিক; স্বরূপ সম্বন্ধে কোনো শেষ সত্য লাভ হয় না, কোনো যুগ

সত্যের নিকটে এগিয়ে যায় খানিকটা, কোনো যুগ পিছিয়ে পড়ে আবার।

কবিতা ব্রহ্মের চেয়ে ঢের অল্প পরিসরের জিনিস—যদি না মনে করে নিই যে একটি তিলের গভীরতার ভিতর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আলোকপাত সম্ভব হয়—কোনো-কোনো মানুষের মনে। সাহিত্যে কোথাও কোথাও তিলার্ধে গভীর কাব্য রয়েছে; তার নিজের স্রষ্টা ছাড়াও তাকে সঠিক ধারণায় ও আস্বাদে গ্রহণ করবার মতো (অন্য সব) মানুষের মনও আছে। কিন্তু তবুও ব্রহ্মাণ্ড, তার ধারণা বা তার কারণের সঙ্গে সমপরিসরের বা সমগভীরতার জিনিস নয় কবিতা—মানুষ না থাকলেও ব্রহ্মাণ্ড থাকবে এবং মানুষ না থাকলেও ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা থেকে যাবে কোথাও, পরিবর্তনকৃৎ হতে থাকবে ক্রমেই—এ রকম একটা আনুমানিক ব্যাপারকে যদি সত্য বলে স্বীকার করে নিই। কবিতা লেখার, পাঠের এবং আলোচনার সবচেয়ে সফলগভীর মুহূর্তে উপরের কথিত ঐ জিনিসটিকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছি আমি।

ব্রহ্মাণ্ড, তার ধারণা ও তার কারণের চেয়ে স্বভাবতই ঢের কম বিস্তারের জিনিস কবিতা। ঢের কম সময়ের ভিতরেও তার সিদ্ধি। যদিও কোনো-কোনো ধার্মিক ও আলোকসাধক মানুষ মনে করে একটি নিপলেও সব সময়েরই স্বাদ অনুভব করার ভিতরে তাদের ধর্ম, তবুও আমার মনে হয় মনকে চোখ ঠার দিয়ে এ রকম ধর্ম সাধিত হয়। মানুষের মৃত্যুর পরেও যদি ব্রহ্মাণ্ড টিকে থাকে, তাহলে কি মানুষকালের ভিতরেও সমস্ত সময়বিৎ হতে পারে মানুষ;আমাদের পৃথিবীতেই প্রতিটি যুগে নতুন নমনীয়তায় দেখা দেয় সময়—সময়ের অর্থগভীরতার পরের পর্যায়গুলো কি করে তাহলে মানুষের মৃত্যুর পরেই ফুরিয়ে যাবে? কোনো-কোনো কাব্যে সময়ের তিলার্ধের ভিতর ব্রহ্মাণ্ডের বেদ অনেক দূর পর্যন্ত ধরা পড়ে যায়; কিন্তু সব সময়-পরিসর বা শেষ পরিসরগভীরতা প্রতিফলিত হয়? কবিতা ওসব ব্যাপারের চেয়ে মোটামুটি ছোট পরিপার্শ্বে কাজ করে। ব্রহ্মের সংজ্ঞা উপনিষদে শেষ হয়নি—শঙ্করেও না—কিংবা প্রফেসর হোয়াইটহেডের (আমি হাতের কাছের যে কোনো একটা আধুনিক প্রামাণ্য উদাহরণ হিসেবে

হোয়াইটহেডের কথা বলছি) 'গড'-এর অনিঃশেষ সেতুর একটা পাথর ছাড়া বেশি কিছু দেখি না আমরা; আরো খানিকটা সেতুর একটা টুকরো দেখি আইনস্টাইনে;—আরো অনেককাল তো পড়ে রয়েছে মানুষের 'উঠতি' ধারণার; সব মিলিয়ে ব্রহ্মা বা নিহিত স্বরূপের আভাস ঠিক করা হবে, এক যুগ বা একজন মানুষের ধারণায় নয়—সব মানুষের মিলিত ধারণাশক্তির ভিতরে—মানবিক সময়ের অনুমানসাধ্য একটা পরিপ্রেক্ষিতে। হয়তো এসব ধারণার ফলে ব্যাপারটা একদিন দাঁড়াবে গিয়ে এই যে উপনিষদের ব্রহ্ম নেই, প্রফেসর হোয়াইটহেডের পদার্থও নেই, কোনো গাণিতিক কারণ অথবা কোনো নিহিত স্বরূপ নেই কিছুই—কিন্তু এই সবই আছে সব সময়ের ভিতরে প্রতিফলিত হয়ে—আজকাল সব সময়েরই একটা একই রঙ রয়েছে নানা রঙের ভিতর বিম্বিত হয়ে—সব সময়কে একই সময়গ্রন্থির ভিতর নিবিষ্ট করে রেখে। কিংবা ধারণার ফল অন্য রকম হবে কিছু; আজকের অনুভূতি ও ধারণা অনেক আধার বদল করে এসেছে, অনেক আধার এবং দরকার হলে আধেয়ও বদল করে দূর ভবিষ্যতের পরিণতিতে গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু কবিতার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে এতটা অন্ধকারে হাতড়ানো দরকার হবে না পাঠকের বা সমালোচকের।

অনেক আগের (কোনো এক শতকের) পাঠকের মনে তখনকার কবিতা সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল পরের যুগের আলোচকের মনে ঠিক সে রকম ধারণা নেই; পরে আরো বদলেছে, মধ্য যুগে অন্য রকম হয়েছে, আধুনিক কালে আর এক রকম। আমাদের দেশে আলাওল কবিতা সম্বন্ধে যা ভাবতেন লিখে যাননি কিছু; (আমি দেখিনি কিছু)। লালন ফকির কবিতা গানের রীতি ও সামাজিক লক্ষ্য সম্বন্ধে কি মনে করতেন, কাব্যের সিদ্ধি বলতে কি বুঝতেন, জানা নেই আমার। আরো আগে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ধারণা অন্য রকম ছিল নিশ্চয়। ঢের পরে ঈশ্বর গুপ্ত কবিতার রঞ্জনী শক্তির কথা কম ভাবেননি; লোকশিক্ষা এতে সম্পন্ন হয়, শ্লেষ বিঁধিয়ে সমাজকে সজাগ করা যেতে পারে মনে করেছিলেন। বঙ্কিমের ধারণা বদলেছে, রবীন্দ্রনাথের

চেতনা বঙ্কিমের মতো ঠিক নয়। আধুনিকদের অনুভূতি ও বোধ রবীন্দ্রনাথের স্তরে নেই, সরে গেছে, বিশেষ হয়েছে। আধুনিকদের কাল কেটে গেলে আরেক রকম স্বতন্ত্রতায় দাঁড়াবে কবিতা; সে কবিতাকে গ্রহণ করবার জন্যে অনুভূতি ও আলোচনা ঠিক আজকের ভাবনা বিচারের কোণ থেকে কাজ করতে পারবে না। কিন্তু কবিতা ও তার সম্বন্ধে অনুভূতি ও বোধ এ রকমভাবে বদলালেও মানুষের মনে স্থায়ী পদার্থ না বদলাবার মতো; নিজের মনের স্থায়িত্বের আলো ফেলে সে মনে রচিত জিনিস—কবিতা সাহিত্য ইত্যাদি বুঝতে গিয়ে বিভিন্ন যুগের ও তাদের নানা স্তরে ফলিত সব ব্যক্তিত্বের তারতম্যটুকু ধারণা করে নিতে হবে। এটা স্থির করে নেওয়া প্রায়ই খুব কঠিন, কিন্তু কোনো সময়ই অজ্ঞেয় বা অসম্ভব নয়। স্থির করে নিলে সমালোচক তাঁর নিজের যুগের কবিতাকে কেন কিভাবে আলোচনা করেছেন বুঝে নিতে গিয়ে টের পাবেন নিজের যুগে বসে অলোচনা করেছেন তিনি একটা খণ্ড সময়ের কাব্যকে (কবিতা প্রায়ই এ রকম ভাবে আলোচিত হয়. এ আলোচনায় ছোট সময়ের একান্ত নিজ লক্ষণগুলোকে বেশি বড় মনে করবার মতো ত্রুটি ও তুচ্ছতার সম্ভাবনা আছে), আরো বেশি কবিতার আরো বড় সময়ভিত্তির ভিতরে নিবিষ্ট থেকে আলোচনা লিখতে পারেননি। নিজের যুগটা হয়তো তাঁর ক্ষয়ে নিপতিত, হতাশ, কৃশ—সমালোচনায় অসুস্থতার ছাপ পড়েছে; নিজের কাল হয়তো নগ্ন আগ্রহে (যুক্তি ও সততার বশে নয়) সমাজহিতৈষী, কাব্যের সমালোচনায় সেই হিতৈষণার কেমন একটা অশিক্ষিতপটু ছায়া পড়েছে তাঁর; কিংবা বিজ্ঞানের ফলিত সফলতার একমাত্র প্রয়োজনে বিশ্বাসী যুগ—কবিতার আলোচনার অন্য সব দরকারী তত্ত্ব কোণঠাসা হয়ে আছে। ঈশ্বর গুপ্ত যখন কাব্য আলোচনা করেছিলেন কিংবা আরও মহত্তর ব্যক্তিত্ব নিয়ে ড্রাইডেন বা জন্‌সন্, তখন প্রায়ই নিজেদের যুগে নিমগ্ন হয়ে আলোচনা করেছিলেন তাঁরা। কবিতা যে ব্রহ্ম নয় সেটা তাঁরা খুব ভালো করেই জানতেন. কিন্তু তবুও কোনো একটা খণ্ড সময়ের চেয়ে ঢের বড় যে কাব্যের দেশ সময় এবং অনেক রকম আলোর নিঃশেষ মিশ্রণে তার আলো

যে দিন ও রাত্রির মতো একটা গভীর ব্যাপার সেটা তাঁরা ধারণা করতে পারেননি—সে রকম ধারণার প্রয়োজনও ছিল না—তখনই—সেই-সেই দেশের প্রথম বাস্তব সমালোচনার পুঙ্খানুপুঙ্খতা নিষ্ঠার সঙ্গে তৈরি হবার সময়। নিজের যুগ ও অন্য নানা যুগের সমগ্র কবিতা ও তার আধারের মতো একটা বৃহৎ সময়কে ধ্যানের ভিতর টেনে নিয়ে একটা মেধাবী সমাহিতি লাভ করে কাব্য আলোচনা করবার প্রয়োজনীয়তা, আমার মনে হয়, কোলরিজই প্রথমে বোধ করেছিলেন ইংলণ্ডে; কোলরিজের সমগ্র সমালোচনা আর্নল্ড বা এলিয়টের আলোচনার চেয়ে স্থিতভিতে গভীরতর হয়ে রয়েছে তাই এবং বিশদ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খও। আমাদের দেশে কোলরিজের ধরনের না হলেও ঈশ্বর গুপ্ত, হয়তো বঙ্কিমের চেয়েও দেশ কালের কবিতা ও সে সবের পর পর যুগগুলো সম্বন্ধে বেশি জ্ঞান ছিল রবীন্দ্রনাথের—খানিকটা অধ্যয়নের ফলে, অনেকটা স্থায়ী কবিস্বভাব বিভিন্ন সময়ের কবিমনের কম-বেশি স্থায়িত্বের সঙ্গে সহজে সম্বন্ধ হতে পেরেছিল বলে। কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার গদ্য সচ্ছল;—সে গদ্যের মর্ম আরো গভীরতা চেয়েছিল; সমালোচনায় এক-আধটা উপমা যা আসবে মাটি-ঘাসের শিশিরে না বেঁধে ভিতরের থেকে ভোগবতীর জল নিয়ে আসবে; উপমার এ রকম ব্যবহারের ফলে, আমার ধারণা, সমালোচনা বেশি সিদ্ধি লাভ করবার সুযোগ পায়। প্রমথ চৌধুরী সামাজিক জীবনের চক্ষুষ্মান লেখক ছিলেন। কোনো বিশেষ সময়ের বিশেষ ধরনের কবিতা যে তিনি বুঝতেন—যেমন ভারতচন্দ্রের বা বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা—এবং সে সম্বন্ধে আলো পরিবেশন ও বিশ্লেষণে প্রায় সিদ্ধির ভূমিতে পৌঁছে গেছেন বোধ করতে দিতেন—সেটা, আমার মনে হয়, কাব্য আলোচনার একটা বিপদের দিকে আমাদের দৃষ্টি সতর্ক করে রাখবে। প্রমথবাবু কবিতা বলতে কোনো- কোনো বিশেষ সময়ের কিছু-কিছু কবিতা বুঝতেন; কিন্তু বিদ্যাপতি ভারতচন্দ্র বা আরো এমনি কয়েকজন লেখকের কাব্য অল্পবিস্তর নিরঙ্কুশ নিক্তি হয়ে উঠতে থাকলে পৃথিবীর বেশির ভাগ কবিতারই আস্বাদ ও মর্ম অবোধ্য মনে হতে থাকে। কোনো সময়ে বা দেশে

কবিতা একটি-আধটি জাজ্বল্যমান বিন্দুতেই সমাপ্তপ্রায় নয়; ঢের বেশি পরিসর রয়েছে; সমস্ত পরিসরই প্রতিটি বিন্দুকে ব্যক্ত করছে এবং প্রতিটি তিল বা বিন্দু সমস্ত প্রসৃতিকে। তবুও দু-চরেটে তিল নিয়ে কবিতার আস্বাদ বা জিজ্ঞাসা বেশি দূর পর্যন্ত সার্থকতার পথে যেতে পারে না—যদি সমস্ত পরিসর সম্পর্কে বোধ না জন্মে থাকে। অধ্যয়ন বা চর্চার অভাবে নয়, কিন্তু কবিমনের সৎ স্থায়ী পদার্থ প্রমথবাবুর মনে কোলরিজ কিংবা রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমের মতো ছিল না বলে, কাব্যের ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে কোনো ধ্যান-গভীর বোধ জন্মাতে পারেনি তাঁর হৃদয়ে। তবুও কাব্যের কিছু-কিছু প্রিয় পরিমিত ক্ষেত্র স্বাদ পেতেন তিনি—আলোচনা করতেন; সেই-সেই অংশের সরস, প্রায় সঠিক আলোচনা—পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্য থাকলে—অসম্ভব নয়। কিন্তু সে সব অংশেরও অধিক সৎ সমালোচনা পাওয়া যাবে কবিতার এটা-ওটা নয়—প্রায় সমস্তটার—প্রায় নিখিল কবিতার সঙ্গে—ভেবে, অনুভব করে— বেশি মর্মগ্রথিত হতে পেরেছে যে—সে রকম সমালোচকের কাছে থেকে।

কবিতার এমন অনেক আলোচক আছেন যে বিশেষ কোনো দেশের ও সময়ের কিছু কাব্য ছাড়া অন্য কোনো কবিতায় তাঁদের রুচি নেই। এ ধরনের আলোচকদের লেখা পড়ে মনে হয় কবিতার যুগ আঠারো শতকে ছিল—কিংবা তারো আগে—তারপর তেমন কিছু কাব্য হয়নি আর, এবং তখনকার কবিতায় যা ব্যক্ত হয়েছে তার ভিত্তিতে কাব্যের স্থায়ী মান ঠিক করে নিতে পারা যায়।

কিন্তু নানা রকম ধারা ও ঐতিহ্যের বিশিষ্ট সব কবিতায় তেমন কিছু রুচি নেই বোধ করলে, গত পাঁচ-সাত শতকের বড় কবি ও সমালোচকদের বিচারে তীর্ণ কাব্যের কিছুটা অংশ ছাড়া আর সব অসার মনে হতে থাকলে—সেই পর্যায় সম্পর্কে এ ধরনের আলোচক বা পাঠক আলোচনা লিখতে পারেন; যুক্তিস্বচ্ছ গদ্যে বেশ পরিষ্কারভাবে বিষয় বুঝিয়ে দিতে চাইলেও এসব আলোচক কবিতার ভিতরে প্রায়ই নিজেদের সংস্কারের জট দেখেন বেশি—কবি, একজন মহৎ কবি, কিভাবে তার উপকরণ ব্যবহার করেছে

সেটাকে ততটা নয়। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এঁরা নিজেদের ধরতাই সংস্কার ভালোবেসে অথবা, অন্যত্র, সমাজের হিত কামনা করে, কবিতা পড়ার নামে কবিতার অব্যবস্থিত উপকরণ পাঠ করে নানা রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করেন।

এসব আলোচকদের হৃদয় খুব সম্ভব ঠিক জায়গায় আছে—মানুষের কল্যাণবাহী হিসেবে। কিন্তু কবিতাকে সমাজের মুখপাত্রের মতো দাঁড় করিয়ে কিংবা যথাসম্ভব শুদ্ধতায় বজায় রেখে—কোনো উপায়েই মানুষের কল্যাণসাধন সহজে ও দ্রুততায় সম্পন্ন হয় না কোথাও। কিছুটা কল্যাণ হতে পারে কোনো-কোনো-দিকে, যুগের আবহও একটু বেশি স্থির হতে পারে—কিছু বেশি মর্মগ্রাহী। এর চেয়ে বেশি কিছু হওয়া কঠিন; সমাজেরও (এখনো যা দেখছি) সেটা মোটেই লক্ষ্য নয়; নিজের চেতনার উন্নতি ও কল্যাণকে খুব স্থূল হাতে বাধা দেয় সমাজ। সমাজকে রুচি ও বিচারে ও সততায় সক্ষম করে তোলার প্রতিভা যে কবিতা ধারণ করে (প্রায়ই সমাজ ও সময়ের নানা রকম মহড়া ও শপথের তাড়াহুড়োয় লেখা নয়) সেটা ধীরে ধীরে সঠিক পদ্ধতির ভিতর দিয়ে অনুভব করতে পারবে হয়তো ক্রমেই আরো বেশি মানুষ। যদি পারে তবে আজকের কবিতা লেখার ফলেই যে সেটা হবে তা নয়। এর জন্যে অনেক আগের কবিতা (ঠিক এই উদ্দেশ্য মনে রেখে নয় অবিশ্যি) কাজ করেছিল একদিন, গত সাত-আট শতকের কবিতাও কাজ করে এসেছে। এই সহমিলন থেকে যে বিশেষ সব আলো পাওয়া গেছে তার ফলে সমাজের আজ পর্যন্তও কোনো উপকার হয়নি একথা বলতে পারি না; পরে বেশি উপকার হবে কিনা তাও বলা কঠিন। কারণ মূল্যের সত্য উৎকর্ষ কিছুতেই স্থির করতে পারছে না সমাজ; যেটুকু স্থির করেছে, কাজে লাগাতে পারছে কোথায় আর তেমন। বিজ্ঞানের সঙ্গে পাশাপাশি অগ্রসর হয়ে কবিতা অনেকদিন থেকে চেতনা জাগিয়ে আসছে—নিজের পদ্ধতির কাছে সত্য থেকে; কবিতার প্রকৃতি নাশ করে সেখানে অন্য কোনো রীতি দাঁড় করালে মানুষের জীবনের কতকগুলো চেতনার অন্তিম সিদ্ধির স্তরই লোপ পাবে। তাতে উপকার হবে বলে মনে

হয় না। গত সাত-আট শতকের কবিতার এই সব স্তর সক্রিয় থাকলে এবং প্রতিটি নতুন যুগের প্রয়োজনে নতুনভাবে উপজাত হয়ে সেই যুগের কবিতার সঙ্গে মিশে একটা বিশেষ সঙ্গতি সৃষ্টি করতে পারলে (এটা করে কারো-কারো হৃদয়ের জন্যে কোনো-কোনো যুগে;কিন্তু ঢের বেশি লোকের ব্যবহারের জন্যে সব যুগেই এই বিশেষ সঙ্গতি পাওয়া যাচ্ছে না আজ পর্যন্ত সমাজ ক্রমেই বেশি ভালো হলেও কাব্য-পৃথিবীর এই সঙ্গতি ক্রমেই প্রায় লোকসাধারণের স্তরে কাজ করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে) সমাজের মর্মের ভিতরে নিজের প্রধান, স্পষ্ট প্রসঙ্গে অনুভূত হতে পারে কবিতা। মর্মে রয়েছে কাব্য অনেকদিন থেকে, কিন্তু বিশেষ কিছু অনুভব করছে না সমাজ। কোনো দেশ ও যুগ কাব্যের উপরোক্ত সঙ্গতির সাধারণ—লোকসাধারণ—প্রকাশ দেখেনি এখনো। সেটা দেখতে হলে সমাজকেই ঢের বদলে যেতেহয়, কিংবা আজ পর্যন্ত মানুষের কাব্যকে—যা কঠিন, বিস্তীর্ণ ও মহৎ তাকে সকলের স্পর্শসাধ্য লোককবিতা হতে হয়। কিছুদিনের জন্যে হতে পারে হয়তো, কিন্তু কবিতা বেশি দিন পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায়ই লোককবিতা মাত্র হয়ে থাকতে পারবে মনে হয় না। মানুষ অনেকদিন বিশদ, অন্তর্গভীর কবিতা লিখেছে; যে সমস্যার কথা এইমাত্র উল্লেখ করেছি তার কোনো রকম মীমাংসা না হলেও লোককবিতায়ই শুধু লেগে থাকবার মতো সরলতা ও নির্দোষ সাচ্ছল্য মানুষের সভ্যতায় নেই এখন আর—দেশকালের অনেক পরিবর্তন পরিণতির থেকে জেগে উঠেছে যারা সেই সব অভিজ্ঞ, বেশি চিন্তিত, বেশি স্থির কবিদের ভিতরেও নেই।

কবিতার আলোচনা

সাধারণত কাব্য অথবা কোনো শতক বা শতকাংশের কিছু কবিতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আলোচনা করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠেনি আমার। দু-চারটে প্রবন্ধ লিখেছি শুধু। আমি আমার নিজের প্রবন্ধ নাড়াচাড়া করে দেখেছি; বিশেষ করে আমার সমসাময়িক এক-আধজন কবির আলোচনা পড়ে আমার মনে হয়েছে মোটামুটি কবিতা বা এ-দশক সে-দশকের কবিতা সম্বন্ধে তাঁরা যা ভেবেছেন বলেছেন সে জিনিস যারা গদ্যসমালোচনা লেখে—কবিতা লেখে না—তাদের মতামতের চেয়ে বেশি সৎ বা অভ্রান্ত বলে সব সময়ই ধরে নিতে পারা যায় না। কিন্তু তবুও অনুভব করেছি কবিতার স্পষ্ট, কুশল, যথাসম্ভব নির্ভরে চিন্তনীয় আলোচনা সেই যুগের কবিদেরই করা উচিত। যাদের মন কবিতা-সৃষ্টির জন্যে তৈরি নয় কাব্য-আলোচনায় তারা পরিচ্ছন্নতা, পাণ্ডিত্য, ভালো অন্তঃপ্রবেশ দেখাতে পারলেও কবিতা সম্বন্ধে তাদের বোধ, আমার ভয় হচ্ছে, শেষ গভীরতা লাভ করতে গিয়ে প্রায়ই ব্যর্থ হয়, বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

কিন্তু যে মানুষ কবিতাই লেখে এবং কোনো-কোনো কবিতা যার সৎ—হয়তো মহৎও—হয়, কবিতার সমালোচনাও কি তাকে লিখতে হবে? বাস্তবিক, কোনো সফল বা সৎ কবি কি কবিতা লিখতে-লিখতে জীবনের কোনো এক স্তরে কবিতা—অন্তত নিজের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা লিখবার তাগিদ বোধ করেন? তাঁর নিজের কবিতা যদি পাঠকেরা বুঝতে না পারে, যদি সে কবিতা—তার প্রাপ্যের চেয়েও বেশি নিন্দা পায় কিংবা যে ভাবে ও সংস্থানে প্রশংসা পাওয়া উচিত নয় সে রকম আন্দাজি স্তুতি যদি প্রায়ই লাভ করতে থাকে—তাঁর কাব্যে কবি কি জিনিস কিভাবে উদ্বোধন করতে চেয়েছেন সে সম্বন্ধে পাঠকের অল্প বেশি অভিজ্ঞতা

থাকলেও এ কবিতাপাঠে তা মোটেই জেগে উঠছে না—এ সব ব্যাপার যখন টের পাওয়া যায়—তখন কবি নিজের কবিতা সম্বন্ধে হয়তো কিছু আলোচনা লিখে সেই কবিতা শরীর ও তার অন্তর সম্পর্কে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার একটা সূত্র পাঠককে ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু অনেক কবিই এ দিক দিয়ে কোনো তাগিদ বোধ করেন না। কবি : তাগিদ তাঁর কবিতা লেখার শুধু। কবিতা ভালো করে লেখা হল কিনা তারও তাগিদ। ভালো করে লেখা মানে নিজের পছন্দকে খুশি করে লেখা নয় শুধু—নিজের বোধিকে পরিতৃপ্ত করে লেখা। কোনো খাঁটি কবির এ ধরনের বোধি যদি সত্যিই তাঁর কবিতারচনে তৃপ্ত হয়েছে বলে বোধ করতে পারেন তিনি—তাহলে সে কবিতা পড়ে পাঠক—তাঁর যুগের প্রায় সমস্ত পাঠকও অন্ধকার দেখতে থাকলে কবি কি করবেন? তাঁর সত্য কথা সার্থকভাবে বলেছেন তিনি; অন্যরা যদি তা ধারণা না করতে পারে, এ কবিতার শরীর ও ভিতরের বেদ সম্বন্ধে যদি তাদের আপত্তি থাকে তাহলে নিজের কাব্যকে এসব পাঠকের কাছে আরও পরিষ্কার করে তোলবার জন্যে পুরোনো, অভ্যস্ত কাব্যশরীর ও অর্থের দিকে ফিরে যাবেন? তার চেয়ে তাঁকে কবিতা লেখা থামিয়ে রাখতে হয়। নিজের কবিতা, পূর্বজ, ও ঈষৎ পূর্বজ কাব্য, এবং আজকের কবিতা সম্পর্কে এক-আধদিন নয়—কিছুকাল ধরে গদ্য আলোচনায় নানা দরকার হতে পারে তাঁর। কিন্তু এরকম অবস্থায়ও খুবই কম কবি নিজের পরের বা এমনি কাব্যেরই অন্তর অন্তঃশরীর স্থির করবার কাজে গদ্য লেখায় উৎসাহ বোধ করেছেন। কবিতা লিখে গেছেন অবিশ্যি; অনাদৃত কবিতা লেখা শেষ হয়ে গেলে আরও সদ্যঃপাতি কবিতা—চারদিককার প্রতিকূলতায় চাপা পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত—কিংবা কিছুতেই চাপা না পড়ে মৃত্যু পর্যন্ত। কবিদের চিন্তাস্বভাব প্রায়ই এই যে কবিতার আলোচনা লেখা অনুভূতি শিক্ষা ও নিরীক্ষার পারদর্শী সমালোচকের কাজ; কবিতা লেখা কবির কাজ; সমালোচনাও সে লিখতে পারে, কিন্তু সে জিনিস প্রথম আকর্ষণ ও ভালোবাসায় খুব সম্ভব লেখা হয় না—প্রাথমিক দায়িত্ববোধে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে (সকলের

বেলা নয়) হয়তো লেখা হতে পারে। সৎকবির নিজের দিব্য অন্তঃকরণকে (কবিতা লিখবার সময় অন্তঃকরণে যে দিব্যতা আসে সেটা বাস্তব, কোনো ধর্ম বা তন্ত্রের পরিভাষা নয়, আমি নিজের অল্প অভিজ্ঞতায় যেটুকু বোধ করেছি তাতে মনে হচ্ছে) পরিতৃপ্ত করে লেখা কবিতা তার একমাত্র ভালোবাসা ও দায়িত্বের জিনিস। কিন্তু দিব্য অন্তঃকরণ যে বাস্তবিক নির্বস্তু নয় সেটা স্বীকার করা সম্ভব হলেও অন্তঃকরণকে তৃপ্ত করে লেখা কি জিনিস? এ প্রশ্নের যথাসম্ভব পরিষ্কার উত্তর দিতে হলে একটা আলাদা সন্দর্ভের দরকার হতে পারে; কিন্তু এ প্রবন্ধে সে অবসর নেই। এক-আধ কথায় বলতে পারা যায় যে, যে কালে যে সমাজে ও যে বিসারে কবি রয়েছেন এবং যে সময়ে যে সমাজে যে বিসারে তিনি ছিলেন না, কিন্তু তবুও যে জিনিসগুলো রয়ে গিয়েছিল, আছে, থাকবে—সে সবের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সৎকবি তাঁর প্রতিনিয়ত শিক্ষিত মনকে আরো বেশি শিক্ষিত করে নিচ্ছেন, যা স্বভাবপ্রতিভা বলে মনে হয়েছিল সেটাকে আরো স্থির ও বিশুদ্ধ করে। এই সবের থেকেই তাঁর কবিতার জন্ম হচ্ছে এগুলোর যথাযথ দাবি মিটিয়ে। যদি কবি মনে করেন তাঁর কোনো একটি বিশেষ কবিতায় এই শিক্ষিত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতায় প্রয়োজন ঠিকভাবে স্থির করতে পারেননি তিনি, ফলে, কবিতার ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, শরীরেও অনেক পরিমাণে, কিংবা শরীর উপর-উপর অক্ষুন্ন রয়েছে, কিন্তু ধর্ম নেই—তাহলে সে কবিতায় চরিতার্থ বোধ করবেন না তিনি; কবিতাটিকে কেটে ফেলতে হবে কিংবা শোধরাবার দরকার। কিন্তু যে কবিতায় সে সব দাবি ও দরকার ঠিকভাবে রক্ষা করা হয়েছে—নিজের সে কবিতায় সিদ্ধ হয়েছেন অনুভব করতে পেরেছেন কবি। তাঁর স্বভাব ও শিক্ষায় অব্যয় স্পষ্টতায় লেখা এই কবিতা। কিন্তু এই শিক্ষিত স্বভাব আরো ভালো ও উন্নত হতে পারে কিনা এর উত্তর সোজাসুজি না দিয়ে বলতে পারা যায় সৎকবির স্বভাব ও শিক্ষা ক্রমেই বদলাচ্ছে; এই বদলানোটাই প্রাণতত্ত্বের নিয়ম, কবিতারও খুব সম্ভব প্রাণের পরিচায়ক। শিক্ষিত স্বভাবের অব্যয় স্পষ্টতায় আজ যে কবিতা সৃষ্ট হচ্ছে তাঁর, সেটা তাঁর কবিজীবনের একটা

পর্যায়ের ভিতর পড়ল; অন্য সব পর্যায় পরে আসছে; পরের পর্যায়গুলো আজকের পর্বের চেয়ে উন্নত বা ভালো হতে পারে, নাও হতে পারে, খারাপও হতে পারে—কিন্তু বিভিন্ন। কবিতার সারাৎসার মর্মের দিক দিয়ে দেখতে গেলে 'শেষ লেখা'কে 'পূরবী'র চেয়ে উচ্চে অগ্রসর বলতে পারা যায় না, অথবা 'পূরবী'কে 'বলাকা'র চেয়ে; কিংবা 'টেম্পেস্ট'কে আগেকার ট্র্যাজিডিগুলোর চেয়ে প্রগতিগভীর বলব? কাব্যে 'অগ্রসর' মানে এক পর্যায়ের থেকে পর্বান্তরে গমন, ফলে মহত্তর কবিতা পাওয়া যেতে পারে, নাও পাওয়া যেতে পারে, কবিতা আগের চেয়ে খারাপও হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু কবির কবিতার পরিবর্তন হয়েছে বলতে পারা যায়; আগ্রহ থাকলে সৎকবির শিক্ষার পরিসর ক্রমে বেড়ে যাবে একথা ঠিক; কিন্তু গভীরতর হবে কিংবা সে শিক্ষা কি কবিস্বভাবকে গভীরতর ভাবে ব্যবহার করতে পারবে? আগ্রহ থাকে সৎকবির, শিক্ষার বিসারও বেড়ে যায় তার, কিন্তু কবিস্বভাবের অন্তর্ভেদী প্রতিভা সমান অনুপাতে বাড়ে না; কোনো-কোনো স্থলে স্মরণীয়ভাবে বাড়ে বটে; অপরদের খুব কমই বাড়ে, অনেকক্ষেত্রে কিছুই বাড়ে না। কিন্তু চেতনা আরো সজাগ ও শিক্ষা আরো বেশি বেড়ে যাওয়ায় কোনো কবির কবিতা তার আগেকার কাব্যের চেয়ে তবুও যদি ভালো না হয় এমন কি খারাপ হতে থাকে তাহলে কবিতার নামে প্রায়ই দর্শন সন্দর্ভ (সমাজ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সব কিছু সম্বন্ধে) পাওয়া যাবে তার কবিতার ভিতরে, বুঝতে পারা যাবে ক্রমেই অনুশীলনের ফলে ভালো করে শিক্ষিত হয়েছে বটে মন ও অভিজ্ঞতা, কিন্তু কবিস্বভাব দুর্বল হয়ে পড়েছে। সকলেই কবি নয়, কবিস্বভাব বলে একটা জিনিস অবাস্তব নয়। কবিস্বভাব ক্রমেই শিক্ষিত ও শুদ্ধ হয়ে প্রতি পর্যায়ে কবিতার সারাৎসার রেখে যেতে পারে; এ রকম পর্যায় থেকে পর্যায়ে তার প্রাণনা চলতে পারে—কবির মৃত্যু পর্যন্ত। আগেরটা কোলরিজের হয়েছিল; আরো অনেকের; আমাদের চোখের সামনে এখনো হচ্ছে। পরেরটা রবীন্দ্রনাথের।

কিন্তু এসব অনুতর্কের ফলে তা হলেও বুঝতে পারা গেল কবির সহজাত গুণ থাকলেই হল না, সহজাতর ফলে তিনি যাকে বলা হয়

স্বভাবকবি সেটা হতে পারেন; অনেক কবি—আমাদের বা অন্যদের দেশে—এ রকম।

লোককবিতা বলতে যা বোঝায় আমাদের দেশে সেটা ভালো জিনিস, কিন্তু নিজের স্বভাবগুণকে আরো শিক্ষিত, ক্রমেই বেশি শিক্ষিত করে নিয়ে ঢের বেশি পরিণতির পথে চালিয়ে নিতে পারা যায়। অনেক বৈষ্ণব কবির সহজাত কবিত্ব ছিল—শিক্ষিত হয়েছিল—কিন্তু তত বেশি শিক্ষিত—দেশ, সমাজ, সেকালের বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক জ্ঞান ও প্রস্থান সম্পর্কে শিক্ষাদীক্ষায় সে রকম কিছু সিদ্ধ—হয়ে উঠতে পারেননি; রবীন্দ্রনাথের সহজকবিত্ব ছিল, কিন্তু এ স্বভাবধর্মকে রবীন্দ্রনাথ নিবারণ পণ্ডিত (আজকাল তার নাম শুনছি, তার সমগ্র কবিতা পড়ে দেখবার সুযোগ পাইনি) কিংবা গোবিন্দচন্দ্রের স্তরে ফেলে রাখেননি; পৃথিবীর ও নিজের জীবনের ক্রমিক অভিজ্ঞতা, কোন অভিজ্ঞতার কি মূল্য সেই চেতনায়, বিজ্ঞান কি দিতে পারছে, পারবে, জ্ঞান কি দিল—এইসব অন্তঃসারের ভিতর দার্শনিকের মতো অতটা সচেতন ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নয়—কান্ট-এর মতো বা মার্কস-এর মতো নয়—কিন্তু তবুও সহজ কবিগুণকে তিনি সজাগ ও তপঃশক্তিশীলভাবে শিক্ষিত ও অনুভূতিঘন ও সুস্পষ্ট করে চলেছিলেন।

যে কোনো সৎ কবিতাই স্বভাবকবিতা, কিন্তু যেখানে কবির অভিজ্ঞতা কম, দু-চারটের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতার ভার বহন করবার শক্তি নেই কিংবা দু-চারটে অভিজ্ঞতাকে দেশকালের ভিতর তলিয়ে অল্প-বেশি স্পষ্টতায় দেখবার ক্ষমতা নেই—সেখানে স্বভাবকবিতা তার প্রথম স্তরে; অভিজ্ঞতা বেড়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে আরো-বেশি সিদ্ধির স্তরে পৌঁছনো সম্ভব; কিন্তু অভিজ্ঞতাকে আজকের সমাজ ও সব সময়ের সমাজ, এ কাল ও সব সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক জায়গায় বসাবার ও প্রতিটি অভিজ্ঞতার সত্য মূল্য (প্রতি যুগেই তা খানিকটা বদলাচ্ছে যদিও) স্থির করবার ক্ষমতা না থাকলে অভিজ্ঞতা গাণিতিক সংখ্যায় বেড়ে যেতে পারে, জীবনের প্রয়োজনে বাড়ে না, ছোট আধারের তলদেশেও পৌঁছয় না, স্বভাবকবিতা

প্রথম স্তরে থেকে যায়। কিন্তু নিজের স্বল্পতায় মুছে না গিয়ে বা নিজেদের বেশি বাহুল্যে চাপা না পড়ে কবির অভিজ্ঞতাগুলো যখন নিজেদের ভিতর সঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছে তখন মনে হয় যে কবির সত্তার থেকে উৎসারিত দানে তারা শিক্ষিত হচ্ছে, নিজেদের সম্প্রদান করে তবুও বীক্ষণে গভীর শিক্ষায় সফল ও শুদ্ধ করে তুলছে কবিকে। কবিদের ব্যক্তিত্বের স্তরভেদ রয়েছে যার ফলে কোনো-কোনো কবি অনেক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে চলে গিয়েও দু-চারটের বেশি ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না—জীবনের বা কবিতার দরকারে। আরো বেশি পারে কেউ কেউ। তার চেয়েও বেশি পারে। সব চেয়ে বেশি পারে। কবিদের ব্যক্তিত্বের ক্রম রয়েছে টের পাওয়া যায়; অভিজ্ঞতাকে কতদূর পর্যন্ত কি হিসেবে ব্যবহার করে কি রকম কবিতা কিভাবে সিদ্ধি লাভ করল সেটা স্থির করে কবিদের উৎকর্ষের ক্রম ঠিক করা যায়।

সহজ বা স্বভাবকবিতা হলেই হল না; সে কবিতা কি রকম স্পষ্ট অভিজ্ঞতার স্বচ্ছ অনুভূতি বা অনেক বেশি অভিজ্ঞতা ও স্পষ্ট বীক্ষা কি রকম মন্ত্রের মতো সিদ্ধ হয়ে রয়েছে সেখানে সেটা দেখতে হবে। কবিদের ব্যক্তিত্বের উচ্চনীচ পার্থক্য অনুসারে একই রকম এবং একই সংখ্যার অভিজ্ঞতার এ রকম বিভিন্ন ব্যবহার হয় যার ফলে এর কবিতাকে চলনসই মনে হয়, ওর কবিতাকে সুন্দর, তার কবিতাকে সৎ, আর একজনের কবিতাকে মহৎ; এত পৃথক তাৎপর্য ও প্রতিভার কবিতা সৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্যক্তিত্বের ছোট বড় স্তর থাকলেও নিজের সহজাত শক্তিকে কেবলই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করা বা স্বল্প সময়ে ব্যাসে সিদ্ধি লাভ করে বড় সময়ের ভিতর তারপর তাকে নিয়ে যেতে পারা যায় কিনা, আজকে সমাজের সমস্ত পরিধিটাকে ধারণা করতে পারা যায় কিনা, অতীতে সমাজের অন্তঃশীল বিষয়কে এ সব অনুসন্ধান সময়ের ও বিসারের ও মানুষের আরো কাছে নিয়ে আসতে পারে কবিকে, যাতে আগের চেয়ে বেশি সত্য বেশি পরিষ্কারভাবে আয়ত্ত হয় তার; আয়ত্ত হলে যেন তা দর্শনের শিখর না হয়ে বসে; সে বিপদ কাটাতে পারলে কবিতায় ভালো ফল পাওয়া যায় :

কবিতার নতুন পর্যায় তৈরি হয়, কিংবা পুরোনো অধ্যায়ের ফাঁকা জায়গাগুলো সম্ভাবনার ক্ষেত্রে পড়ে থাকে না তেমন আর, সৎ কবিতায় পরিণত হতে থাকে—অল্প—বেশি—জনিতা কবির ব্যক্তিত্বের তারতম্য অনুসারে।

নিজের অল্প অভিজ্ঞতার পটে কম বেশি গভীরতা ফলিত হয়েছে, অভিজ্ঞতা বাড়াতে গেলে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বার সম্ভাবনা : আমাদের দেশের কবিদের ভিতর এদের সংখ্যাই বেশি; বাংলাদেশে আধুনিক কবিতায় যে কাল চলেছে সেখানে বিশাল অভিজ্ঞতা মহৎভাবে শিক্ষিত এরকম কাব্য খুব সম্ভব নেই। আছে? কম বেশি অভিজ্ঞতা সৎ নিয়মে শিক্ষিত এরকম কবিতা রয়েছে কম না; বেশি অভিজ্ঞতা বিশেষ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে কাব্যে এ জাতীয় কবিতা অনেক আছে। আমাদের দেশের আধুনিক বড় ধরনের কবিরা অভিজ্ঞতার যে-দুটো মুখ থাকে—একটি, জীবন ও আর একটি, গ্রন্থে সংস্কারে প্রতিফলিত জীবনের দিকে এগোনো—তার শেষোক্ত মুখটিকে, আমার মনে হয়, গ্রহণ করেছেন বেশি; পাণ্ডিত্যকে জ্ঞানে পরিণত করতে চাচ্ছেন জীবনের সাহায্য নিয়ে অবশ্য; কিন্তু পাণ্ডিত্য ঠিক নয়, জ্ঞানের সাহায্যে জীবনকে বুঝেছে ইতিহাসের বৃত্তান্তকাল ধরে যারা, বুঝে আসছে জীবনের সাহায্যে জ্ঞানময়তাকে। আধুনিক কবিতার দুটো-চারটে বই পড়লে অবশ্য বিশেষ কিছু বোঝা যাবে না—সমস্ত ভালো বই ও এই কবিতার সমস্ত জীবনকাল সমাপ্ত না হলে বুঝতে পারা যাবে না আমাদের কবিতা জীবনে গভীর, না জ্ঞানে শুধু, না বুদ্ধি ও সংস্কারের রসে কেবলমাত্র। কেবলমাত্র বিদগ্ধতার চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি জিনিস রয়েছে এই কবিতায়; আমার মনে হয় উপরোক্ত তিনটে জিনিসেরই মিশ্রণ রয়েছে অনেক কবিতায়; অস্পষ্ট মিলন রয়েছে অনেক কবিতায়, কিন্তু চরিতার্থ দেহমিলনের ফলে একটি মাত্র বিদেহ স্পষ্টতার প্রকাশ—আমি কোনো আবছা পরিভাষা ব্যবহার করতে চাচ্ছি না, যা বোঝাচ্ছে আমার মনে হয় ধারণার বাইরে নয়—কটি কবিতায় আছে? মহৎ কবিতা জ্ঞানে গভীর নয় শুধু, অথবা প্রাকৃত জীবনের ব্যাপার নিয়ে

নিবিড় নয় কেবল মাত্র; কিন্তু এই দুই জিনিস মিলে এক হয়ে গেছে সেখানে এমনই আত্মিক নিবিড়তায় ও গাণিতিক শুদ্ধতায় যে সহসা মনে হতে পারে যে মিলনোৎপন্ন কবিতা জ্ঞান নয় আর, জীবনও নয় যেন, জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল জিনিস; কিংবা জীবনকে কোনো আলাদা জগতে নিয়ে নতুন করে তাকে সৃষ্টি। কিন্তু তবুও কবিতা এই পৃথিবীর এই জীবনের যত নিকটে, কোনো আলাদা জগৎ বলতে যা বোঝায় তার নিকটে ততটা নয়; কবিতা জীবনের থেকে কিছুটা দূরে— সেটা লক্ষিত করে রাখবার জন্যে নিজের বা পাঠকের মনে কোনো সমান্তরাল রেখা আঁকা দরকার মনে করে আলোচক অযথা আনুষ্ঠানিক হয়ে পড়তে পারেন; কারণ জীবনের যত কাছে কবিতা ও তার সংজ্ঞাকে নিয়ে আসতে পারা যায় তত তাকে শিল্পপ্রসাদে শুদ্ধ করা সম্ভব, নিছক শিল্পের কাছে নিয়ে গেলে সেরকম ভাবে সম্ভব হয় না।

এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে আমি বলেছি যে কবি যদি কিছু লিখতে চায় তাহলে কাব্য এমন কি নিজের কবিতা সম্বন্ধেও পাঠকের খটকা ঘোচাবার দরকারে পরিষ্কার গদ্য আলোচনা লেখার চেয়েও অস্পষ্ট (তার পাঠকদের মতে) কবিতা লিখতেই ভালোবাসে বেশি; কবিতা লেখা চাই; প্রবন্ধ হয়তো পরে লেখা হবে; অথবা প্রবন্ধে কোনোদিন হাত দেওয়া হবে না হয়তো। কিন্তু লোকে যদি কবির কবিতার কোনো সঙ্গতি ধরতে না পেরে ব্যাহত হতে থাকে তাহলেও নিজের বিবেকের কাছে খাঁটি থেকে নতুন কবিতা লিখতে (অর্থনৈতিক পীড়নে ক্লান্ত না হয়ে পড়লে) নিরুৎসাহ বোধ করে না কবি; বিবেক বা উপলব্ধির কোথাও কোনো ছিদ্র আছে কিনা বিচার করে দেখে, ভুল শোধরায়, বিশুদ্ধ করে, পুনরায় কবিতা লিখতে চেষ্টা করে। কিন্তু কবিতা কি— কি করে রচিত হয়—কবিতায় কি কাজ হয়—খুব আশ্চর্যের বিষয় এ সম্বন্ধে নিষ্কবি গদ্য-সমালোচকেরা অনেক সময় এমন অজর দৃষ্টির প্রমাণ দিতে পারেন যে কি করে তা দিতে পারেন ভেবে কবির আত্মস্থ মন মাঝে-মাঝে ভেঙে পড়ে খুব সশ্রদ্ধ ও সত্য বিস্ময়ে। অথচ সে সব লেখকেরা এক লাইনও কবিতা লেখেননি। আমি নিজে এঁদের

(বিদেশী সমালোচক তাঁরা সব) কারো-কারো প্রবন্ধ পড়ে অবাক হয়ে ভেবেছি কি করে কবিতা সৃষ্টি হয় সমস্ত প্রণালীটার ঘাটে-ঘাটে হাত টিপে সত্য কথাই বলেছেন তাঁরা, এবং এমন কোনো-কোনো কথা বলেছেন যা অসার বলতে পারি না। কিন্তু তবুও কবিতা সম্বন্ধে বড়, সত্যার্থী আলোচনা কবিদেরই করা উচিত—সৎ কবিদেরই নিজেদের অনুভূতি ও চিন্তার কবিতাত্মক প্রয়োগ থেকে তাদের খুলে নিয়ে অন্য প্রয়োগে—কবিতা সম্পর্কে আলোচনায়—মাঝে মাঝে নিয়োজিত করা দরকার। কোনো ভালো কবির কোনা একটি কবিতার বই কিংবা এদেশের আধুনিক কালের কবিতা অথবা এমনি মোটামুটি কাব্য সম্বন্ধে বড় কবিরা যদি সময় করে স্থিত, শুদ্ধ হয়ে, দল ও বন্ধুত্বের ব্যাস থেকে মুক্ত, যথাসম্ভব-স্বচ্ছ ও ধ্যানসাধ্য প্রবন্ধ লেখেন তাহলে সে সব লেখায় আশা করা যায় পাণ্ডিত্যের চেয়ে জ্ঞান বেশি থাকবে। পাণ্ডিত্যের চেয়ে জ্ঞান পরিচ্ছন্ন। লাভ হবে অন্য কবিদের, কবিতার পাঠকদেরও। আমাদের দেশে গত দশ-পনেরো বছরে দেখা গেছে এমন সব লোক কবিতা সঙ্গীত মজলিসী সমাজকথা দেশ-বিদেশের মানে ও মেজাজ সম্বন্ধে একই নিঃশ্বাসে ভাষ্যকারের ভূমিকায় এমন আশ্চর্য সিদ্ধি দেখিয়ে গেছেন যে কবি ও কবিতা কতকগুলো কবিতার বই ও সংকলন সম্পর্কে অনেক আধাআধি সত্য ও অস্পষ্ট ধারণা এখনো জের টানছে। ভাষ্যকারদের কোনো অসৎ লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু সাহিত্য—বিশেষ করে কাব্য সম্বন্ধে কোথাও-কোথাও কিছু-কিছু নির্ধারণ শক্তি থাকলেও, কাব্যের দরকারী পটপরিসর সম্পর্কে বই পড়ে কিছু জ্ঞান সঞ্চ য় করলেও সে পটভূমির ভিতর স্বভাবত বাস করবার রুচি বা ক্ষমতা ছিল না তাঁদের। এর ওর কবিতা বা এই সেই বই বা সংকলন নয়—দেশ ও সময়ের মোটামুটি কবিতাসত্যে আত্মস্থ হতে পারলে নিজেও একটি সৎ কাব্য সৃষ্টি করতে পারে মানুষ যে প্রেমে ও বোধে সেই নির্মল অব্যর্থ গুণের অভাব দেখা গেছে। এরকম মানুষদের হাতে কোনো যুগের কোনো দশকের কাব্যের বড় সমালোচনা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। গত পনেরো-কুড়ি বছর (এক আধজন স্থিরতর বোধে সুচালিত কিছু-কিছু স্পষ্ট

আলোচনা ছাড়া) এ কালের বাংলা কবিতার সমালোচনা এঁদের হাতে অর্পিত ছিল দেখেছি। আসছে পনেরো-কুড়ি বছর কবিতার বড় সমালোচনার কর্তৃত্ব এঁদের হাতে ফিরে যেতে পারে আবার। সমালোচনার ক্ষতি হবে তাতে; কবিতারও ক্ষতি হবে; পাঠকেরাও ভুল জিনিস চাইবে কবিতার কাছ থেকে। যে সব কবি লোকপ্রিয় হতে চাইবে তারা কি ঠিক জিনিস দিতে পারবে? তাদের যদি প্রতিভা থেকে থাকে তাহলে আশঙ্কা হচ্ছে অপসমালোচনার ফলে সেটার সঠিক ব্যবহার না হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। যে কবিরা প্রতিভায় আত্ম-আলোচনায় আরো স্থির তাদেরও খুব সম্ভব নির্বেদ বেড়ে যাবে; অপজাত সমালোচনার জাতক পাঠকদের দিকে তাকিয়ে সে সব কবিদের মনে আলো বেশি দিন কি তাদের রক্ষা করতে পারবে? কবিতার সমালোচনা কেবলই ভুল ও খারাপ হলে দেশে সেই সমালোচনা সাধারণ পাঠকের ব্যবহারের জন্যে আলোচনাবেদ সৃষ্টি করতে থাকে; তাতে বড় কবিদের কবিতাও নষ্ট হতে যেতে পারে কিংবা এমন দিকে মুখ ফেরাতে পারে যাতে কবিতার সুধী ও বিবেকী পাঠককেও ফাঁপরে পড়তে হয়। কবিতার শিক্ষিত ও সুস্থির পাঠক হয়েও কোনো লাভ নেই—এই সব মুষ্টিমেয় পাঠকদের এই উপলব্ধির ফলে একদল বিভ্রান্ত, স্বতঃসিদ্ধ পাঠক ছাড়া কেউ আর বড় বেশি থাকে না কবিতা পড়বার জন্যে। কতকগুলো লোকপ্রিয় বা তেমনই আলোকপ্রিয় অস্পষ্ট কবিতা বা এদের মাঝামাঝি অনেক কবিতাসঙ্কর পড়তে পড়তে অবশেষে মনে হতে পারে দেশে কবিতার যুগ খুব সম্ভব শেষ হয়ে গেছে। বড় কবিরা অসৎ সমালোচনা অগ্রাহ্য করে প্রায়ই বিপদ উত্তীর্ণ হতে জানে, কিন্তু সে সব কবিরা ততটা সৎ হতে পারেনি—হয়তো হতে পারত, তাদের সম্ভাবনা যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, পাঠকদের দিক থেকেও খারাপ কবিতার থেকে ভালো কবিতা এবং সব কবিতার থেকেই মহৎ কবিতা চিনে নেবার আগ্রহ যাতে ক্রমেই শিক্ষিত, এবং চিনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে—এই বোধ যাতে ক্রমেই নির্দিষ্ট স্বভাবে পরিণত হতে পারে এজন্যে কোনো এক যুগে বা দশকে-দু-দশকে কাব্য সম্বন্ধে পরিষ্কার কথা বলা, কি কবিতা পাওয়া

যাচ্ছে না, বা যা পাওয়া যাচ্ছে তাদের কি মূল্য—অভিজ্ঞ কবিদেরই এসব স্থির করা দরকার। কবিতা লেখবার জন্য দরকারী অনুভূতি ও জ্ঞান থেকে সমালোচনার বেলায় তেমনই জ্ঞানপরিসরের ও তার গভীরতর কিছু বেশি স্পষ্ট, যুক্তিআলোকিত, দ্বিতীয় স্বরূপের দিকে মাঝে-মাঝে নিজেকে নিবিষ্ট করে রাখা দরকার কবির।

ইংলণ্ডে কবিতার বিশেষ পাঠ—বড় সমালোচনা—কবিদের দিয়ে ধারাবাহীভাবে করা হয়েছে : ড্রাইডেনের পর জনসন, তারপর কোলরিজ, অল্প পরিসরে খুব বিখ্যাতভাবে ওয়র্ডসওয়র্থ, পত্রের ভিতর দিয়ে কীটস, ডিফেন্স-এ শেলী, পরে আর্নল্ড, ইয়েটস ও পাউণ্ড—আজকাল এলিয়ট। আমাদের দেশেও ঈশ্বর গুপ্ত, পরে বঙ্কিম, তারপরে রবীন্দ্রনাথ, তারপরে প্রমথ চৌধুরী; (আধুনিক কবিতা এমন কি রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধেও প্রমথবাবু যদিও তাঁর নিজের মনের স্বভাব স্বচ্ছতা দিয়ে গভীরতার ও প্রসৃতির কাজ চালাতে চেয়েছিলেন। তাও হয়। কিন্তু সব সময় হয় না। প্রমথ চৌধুরী আধুনিকদের বা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সারাৎসার কবিতাগুলো ঠিক ধরতে পারেননি : কবিতাসৃষ্টির চেয়ে গদ্য রচনায়ই তাঁর বেশি সিদ্ধি ছিল বলে। গদ্য লিখলেও প্রমথবাবুর চেয়ে অবশ্যই বড় কবি বঙ্কিম) প্রমথ চৌধুরীর পর কবিতা সম্বন্ধে, ততটা স্বচ্ছ নয়—কিন্তু তার চেয়ে বেশি নিশ্চিত, বেশি মর্মগ্রাহী, আলোচনা এক-আধজন যাঁরা করেছেন তাঁরা আরো ভালো কবিতা লিখবেন আশা করা যায় (ভবিষ্যৎ সমালোচনারও ভরসাস্থল এরই ভিতর), যা লিখেছেন তার অনেকখানি অসৎ নয়, কিছু কাব্যকে কেউ-কেউ মহৎ বলবে, সময় কি বলবে (কবিরা এখনো লিখছেন) স্থির করবার জন্যে আরো কিছু সময়ের দরকার।

১৩৫৬

আধুনিক কবিতা

সব সময়ের জন্যেই আধুনিক—এ রকম কবিতা বা সাহিত্যের স্থিতি সম্ভব। তার কারণ এই : মানুষের চিন্তা ও ভাব মধ্যযুগে বা আজ বা আঠারো শতকে সুস্থ বা অসুস্থ হয়ে ওঠবার অবকাশ পায়—কিন্তু আমাদের বোধগম্য সাফল্য বা অসার্থকতার (নানারকম স্তরের) অতীত কোনো প্রস্থানের ভিতরে চলে যেতে পারে না।

আমি অন্য কোনো প্রবন্ধে অন্য এক জায়গায় বলেছি, মানুষের মনের চিরপদার্থ কবিতায় বা সাহিত্যে মহৎ লেখকদের হাতে যে বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হয়ে ওঠে তাকেই আধুনিক সাহিত্য বা আধুনিক কবিতা বলা যেতে পারে। এই হিসেবে মহাভারতের কোনো কোনো অংশ আধুনিক কাব্য—এবং সোফোক্লেস ও ঈসকাইলাসের কিছু-কিছু; আগেকার যুগের আরো কোনো-কোনো কাব্যের নাম এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে; পরে মধ্যযুগের (নানা দেশের) ও তারপরে কয়েক শতাব্দীর—বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক অবধি—বিশেষ সব কবিতা এই হিসেবে আধুনিকতার দাবী জানালে আজকের কৃতী পাঠকের চেতনায় তা প্রত্যাখ্যাত হবে বলে মনে হয় না।

কি কারণে কবিতা সৎ বা অসৎ হয়—কিংবা কোনো কবিতা অসৎ বা সৎ—সে আলোচনায় এখানে প্রবেশ করব না। বিশেষ কোনো কর্তব্য বা দায়িত্বের খাতিরে যে-পাঠক বা আলোচক কবিতা পড়া দরকার মনে করেন—যেমন আমাদের দেশের (ইউরোপের কথা এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি বাদ দিচ্ছি) অনেক কলেজ বা য়ুনিভার্সিটির কোনো-কোনো সাহিত্যের অধ্যাপক মনে করেন—তাঁদের কাছে সৎ কবিতা সব সময়ে সরস জিনিস বলে মনে না হলেও (কারো কাছেই সব সৎ কবিতাই উপভোগ্য নয়) সে

সব পুরোনো কবিতার মূল্য যে-উপায়ে তাঁরা নির্ণয় করেন, কোনো নতুন কবিতার সদসৎ বৈশিষ্ট্য স্থির করতে গিয়ে সে উপায়ের ভিতরকার অভাব ও অসাবধানতা প্রায়ই ধরা পড়ে—বোধ করেছি আমি আমাদের দেশের—শুধু বাংলাদেশ বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়—এ দেশের সমস্ত কলেজ ও য়ুনিভার্সিটির ইংরেজির (ও প্রাদেশিক ভাষাগুলোর) অধ্যাপকদের কথা বলছি। ইংরেজির অধ্যাপকদের বিশেষ করে। চসার থেকে ড্রাইডেন, পোপ থেকে বাইরন, ও ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ থেকে টেনিসন পর্যন্ত ইংরেজি কবিতা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা স্বচ্ছ, স্বীকৃত সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁদের অনেকেরই কিছু অন্তর্ঘন পরিচয় টের পাওয়া যায়—এমন কি সুইনবর্ণের কবিতা সম্পর্কেও—এবং জর্জিয়ানদের; কিছুকাল থেকে এলিয়টকে নিয়ে নানা দিকের উৎসুক ভাবুক ও পণ্ডিত মহলে—য়ুনিভার্সিটিতেও—কথাবার্তা চলছে বলে (এলিয়ট সম্বন্ধে কয়েকখানা প্রায় প্রামাণ্য আলোচনার বইও ব্রিটিশ সমালোচকদের হাতে ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে) এলিয়ট সম্বন্ধেও। কিন্তু এলিয়ট-এর পরে কয়েকজন কবি জন্মেছে অডেন-সংঘের আবির্ভাবের কিছু আগে ও পরে—ব্রিটেনে—আমাদের দেশে—ফ্রান্সে, স্পেন গ্রীস ইটালীতে—ইউরোপের নানা জায়গায়, রাশিয়ায়—আমেরিকায়। এসব কবিদের নতুন কবিতা সম্বন্ধে উপরোক্ত পাঠক ও আলোচকদের মতামতের স্পষ্টতা বা শিথিলতার থেকে বুঝতে পারা যাবে, আমাদের দেশের শিক্ষিত ও কাব্য জিজ্ঞাসু মন কবিতাপাঠ (রসাস্বাদ ও মূল্যনির্ণয়) সম্পর্কে যে পথ আশ্রয় করে চলেছে তা কী রকম ও কতদূর সত্য। শেক্‌স্‌পীয়র বা ওয়ার্ডস্‌ওয়র্থ—এমন কি ডান্ বা এলিয়ট সম্বন্ধে তাঁদের মতামত থেকে আমাদের দেশের আজকের এ জাতীয় কাব্যপাঠক ও কাব্যপাঠ কতদূর স্পষ্ট ও সার্থক উপায়ে অগ্রসর হচ্ছে সে সম্বন্ধে কোনো স্থির ধারণায় পৌঁছুনো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

য়ুনিভার্সিটি ও কলেজের ইংরেজি, প্রদেশী (ও সংস্কৃত) সাহিত্যের অধ্যাপকেরাই যে সাহিত্য সম্বন্ধে সব চেয়ে অভিজ্ঞ ধারণা ও রুচির প্রমাণ

দেবেন এ রকম দাবি অবিশ্যি জানাচ্ছি না আমি। ইংলণ্ডে সমালোচকদের ভিতর আর্নল্ড অবশ্য কবিতার অধ্যাপক ছিলেন; এলিয়টও কাব্যসাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন—যদিও কাব্যের অধ্যাপক হিসেবে তিনি সকলের কাছে সুপরিচিত, কিংবা কারো কাছেই সবিশেষ গণ্য হয়ে, টিকে আছেন কিনা ঠিক বলতে পারছি না আমি।

ও দেশে কবি সাহিত্যিকেরা বিশদ, বড় সমালোচনায় কাজ চালিয়ে এসেছেন; ড্রাইডেন, জনসন, কোলরিজ, ওয়র্ডসওয়র্থ, কীট্‌স, শেলী (এক হিসেবে বিশেষ ভাবে), ইয়েটস, এজরা পাউণ্ড; য়ুনিভার্সিটি বা কলেজের অধ্যাপকদের চেয়ে (অবশ্য কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এঁদের কেউ-কেউ নিজেরাই বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক) কবিরা ও আমাদের দেশে কবিতার ধারণা ও আলোচনা সম্বন্ধে বেশি সফল বোধশক্তির পরিচয় দিতে পেরেছেন, এই আমার মনে হয়। কিন্তু তবুও আমাদের দেশের পুরোনো কবিদের মূল্য যে পদ্ধতিতে স্থির করবার চেষ্টা করলে তাঁদের কাব্য সম্বন্ধে বিচার—আমার ধারণায়—আরো পরিষ্কার হয়ে উঠতে পারে—সে কাজে আমি নিজে অন্তত হাত দিতে নানা কারণেই ইতস্তত বোধ করি; কিন্তু আমার চেয়ে সম্পন্নতর আধুনিক দু-একজন কবি এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিলে আগেকার যুগের বাংলা কাব্য সম্বন্ধে এখনকার, ১৯১৫ থেকে ৫০ ও পঞ্চাশোত্তর, কবিমনে জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা খুব সম্ভব অত্যন্ত আবশ্যিক এক সেতুর মতো হয়ে দাঁড়াবে, পাঠককে ধারণার আরো—হয়তো অনেকদূর পর্যন্ত—যাথার্থ্যের দিকে পৌঁছিয়ে দিতে।

আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে আজকের কবিদের বিবেচনা ও বিচারের মূল্য কালকের প্রবীণ সমালোচকদের কাছে পুরোপুরি গ্রাহ্য হবে না, এইজন্যেই শুধু নয় যে ভবিষ্যতের নির্মিতি ও উদ্দেশ্য এ বিধান বর্তমানের মতো নয়; কাব্যজিজ্ঞাসার এ পর্যন্ত যে মান পেয়েছি আমরা আমাদের আজকের কবিতার আজকের বিচারে সেই মান অনুযায়ী পথে চলেও অনুভূতি ও বিচারের ভুল থেকে যাবে; কম ভুল থেকে যাবে আশা করা যেতে পারে, কিন্তু ভুলের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে; কিন্তু তবুও যাঁরা কাব্যের ভাষা, যুক্তি(

ও হৃদয়বেদের সংস্কার ও নতুন সঙ্গতির দরকার রয়েছে অনুভব করে গত দু-তিন দশক ধরে কবিতা লিখছেন, একালের কবিতার একটা মোটামুটি সঙ্গত ধারণা ও জিজ্ঞাসা তাঁদের আলোচনার ভিতরে যত বেশি স্পষ্টাকারে ফুটে উঠবে, শুধু গদ্য রচনায় অভ্যস্ত কোনো সমালোচকের প্রবন্ধে সে রকম হবে বলে মনে হয় না।

আজকের যুগের বিশেষ কতকগুলো লক্ষণ এ কালের কবিতায় থাকে: দেশকাল সন্ততি (আজ পর্যন্ত মানুষের ধারণায় তাদের যেরূপ আমরা পাই সেই রূপ) যে কোনো যুগের প্রাণবস্তু বলে পরিগণিত হবার সুযোগ যে-কাব্যে লাভ করেছে সে-কবিতা আধুনিক। প্রথম ধরনের আধুনিক কবিতায় মরপদার্থ থাকবার সম্ভাবনা বেশি—যদিও এই সব কবিতার ভিতর থেকেই প্রতি যুগেই সমস্ত উত্তরযুগের কাছে অল্পস্বল্প কবিতা—সৎ কিনা, সংরক্ষিত হতে পারে কিনা,—এই প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়। টমাস মূর ভেবেছিলেন শেলীর কবিতা অসৎ, বিচারপতি জেফ্রিও; অন্য এক হিসেবে আর্নল্ড-এরও তাই মনে হয়েছিল; আজকের দিনের এলিয়ট-এর মতো সমালোচকেরও শেলীর কবিতা সম্বন্ধে মোটামুটি যে বিমুখতা রয়েছে মূর-এর বিরূপতার চেয়ে তা বেশি যুক্তিনির্ভর। কিন্তু তবুও শেলীর কবিতা উনিশ শতকের গোড়ার দিককার চেতনা উদ্ভাসের পৃথিবীতে মাত্র সত্য ও (সেই সময়ের সম্পর্কে) আধুনিক এ কথা মনে করা—আমার ধারণায় অন্তত—ঠিক নয়: এ কাব্য এর নিজের বিশেষ মর্মে যে সাফল্য লাভ করেছে তাতে দুই দশক বা এক শতকের নির্দিষ্ট মাত্রা উত্তীর্ণ হবার শক্তি রয়েছে। এদেশের এবং বিদেশের বড় কবি ও সমালোচকদের কারো-কারো কাছে, ও কোনো-কোনো সতর্ক ও সুনিয়ন্ত্রিত পণ্ডিত মনের নিকটে, শেলীর কবিতা আজ পর্যন্ত আধুনিক। আমার মনে হয় শেলীর কবিতার সম্বন্ধে নিজেকে সরাসরি বিমুখ বোধ করলে মনের প্রবীণতা খুব সম্ভব প্রমাণিত হয় না—রুচির তারতম্য ধরা পড়ে। শেলী বেশি আয়ু পেলে তাঁর কবিতা যে-হিসেবে প্রবীণতা লাভ করবার সুযোগ হয়তো পেতে পারত, ড্রাইডেন-এর কবিতায় প্রবীণতার স্তর তার চেয়ে অন্যরকম; কবিদের ভেতরে পার্থক্য

রয়ে গেছে এবং কবিতার পাঠক ও সমালোচকদের ভিতরে। সমালোচক হিসেবে কোলরেজ ও এলিয়ট—ইয়েটস ও পাউণ্ড-এর উপলব্ধি ও অনুমিতির এত বেশি প্রভেদ তাই। বঙ্কিম ও ঈশ্বর গুপ্ত প্রায় একই সময়পুরুষের আশ্রয়ে লালিত হলেও হৃদয়ঙ্গম ও রসাস্বাদ করবার শক্তিতে অনেকখানি পৃথক; দুজনেই মধুসূদনের চেয়ে ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ শেলীকে আর্নল্ড-এর চেয়ে স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং এলিয়ট ইংলণ্ডের জর্জীয় কবি ও সমালোচকদের চেয়ে বেশি যুক্তিসিদ্ধ ভাবে। আমার মনে হয় এলিয়ট যা পেরেছেন তার চেয়ে বেশি সংশ্লেষপূর্ণ প্রাণবত্তায় ইংলণ্ডের উনিশ শতকের কোনো-কোনো কবিকে ধরতে পেরেছেন রবীন্দ্রনাথ—যদিও এলিয়ট-এর বিচার ও বিশ্লেষণ, ও যে ভাষায় তা প্রকাশ করা হয়েছে সেই সমীচীন মেধাউজ্জ্বল স্পষ্টতার ফলে আমরা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচাররুমের সেন্ট্‌স্‌বরী, হারফোর্ড ও র‍্যালে পেরিয়ে তারপর, যা জ্ঞান লাভ করেছি—এলিয়ট-এর সমালোচনা অবর্তমান থাকলে সেটা পাওয়া কঠিন হত নিশ্চয়ই ;এলিয়ট-এর আলোচনা পদ্ধতি ও মীমাংসার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত মতভেদ রয়েছে অনেকখানি যদিও।

উপরের অনুচ্ছেদের প্রথম অংশে কাব্যের দুই ধরনের আধুনিকতার কথা আমি বলেছি। নিজের যুগের স্থূল সব লক্ষণে অতিরিক্ত সংক্রামিত হয়ে প্রথম ধরনের আধুনিক কবিতা, যুগের ভিতরে পর্যবসিত হয়ে, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরে আমাদের দেশে যে সব কবিরা লিখেছিলেন—সে যুগের বড়, বিশিষ্ট সব মর্ম ও সত্য তাঁরা ঠিকভাবে ধরতে না পারলেও—তাঁদের কবিতা সে কালেরই কতকগুলো আনুষঙ্গিকতার রীতি ও রাগে এত বেশি আচ্ছন্ন হয়ে ছিল যে, সহজ সাধারণ পাঠকদের (ও তাদের তখনকার কবিদের) ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে এসব ভাসমান 'সামাজিক' জিনিসগুলো—জাতির পাঁতির অন্যায়, পাতিল বিল কেন বাতিল হল ও তার কী অর্থ ও পরিণাম, হোমাপাখির (হোম রুলের) ডিম কী জাতীয় জিনিস, অস্পৃশ্যতা, বিধবারা পতিতারা সমাজে কী অতিপ্রাথমিক সমস্যার সৃষ্টি করছে (সমস্যাকে আরো স্পষ্ট ও

একান্তভাবে ধারণা করবার চেষ্টা না করে)—এ সব ভাসমান ধার্য জিনিসগুলো ছাড়া কবিতার অন্য কোনো সত্য বিষয়বস্তু নেই, কিংবা এ বিষয়গুলোকেও চিন্তা ও ভাবের বিখ্যাত বিধানের ভিতর দিয়ে অন্য কোনোরকম সার্থকতায় উন্নত করা যায় না।

প্রেম সম্পর্কে তাঁরা কবিতা লিখেছেন এবং কাহিনী প্রকৃতি ও দিনানুদিনের (খবরের কাগজের রিপোর্টের) ঘটনা সম্পর্কে; কিন্তু সমস্ত কিছুই তাঁদের কাছে তখনকার দুই বা আড়াই দশকের স্থিত, সহজশিক্ষিত বাঙালী মনের অনুমোদিত, একই অর্থ ও উদ্দেশ্যের বিভিন্ন লক্ষণ হিসেবে ধরা পড়েছে, সম্ভ্রমে গৃহীত হয়েছে। এসব কবির এসব কবিতাকে তখনকার দিনে আধুনিক—এমন কি রবীন্দ্রনাথের সে-সময়ের কবিতার চেয়ে বেশি আধুনিক—বলে মেনে নেওয়া হত। এ সব কবিরা—অনেক বড় সময়সাপেক্ষ ইতিহাসকে তো নয়ই—নিজেদের যুগকেও যে আরো পরিষ্কার ও ব্যাপকভাবে ধারণা করতে পারেননি, কবিশক্তির সেই দুর্বলতার জন্যে যেটুকু ধারণা করেছেন তারও মোটামুটি সত্য প্রকাশ তাঁদের হাতে সম্ভব হয়নি; প্রায়ই সৎ হয়নি তাঁদের কবিতা। প্রথম অর্থে আধুনিক হয়েছিল মাত্র: সেই আধুনিকতার সময় ফুরিয়ে গেলে কোথাও-কোথাও কিছু-কিছু আঙ্গিকের তাৎপর্য ছাড়া অন্য তাৎপর্য নষ্ট হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের সে সব দিনের অনেক কবিতা আজও আধুনিক।

আজকের—মানে এ যুগের তৃতীয় থেকে পঞ্চ ম, হয়তো ষষ্ঠ দশকের পৃথিবীর কবিতাও সব জায়গায়ই নিজের যুগকে ব্যাপক ও পরিষ্কারভাবে ধারণা করতে পারেনি, কিন্তু কোনো-কোনো জায়গায় আধুনিক কবিদের কেউ-কেউ তা পেরেছে; পূর্বজদের (রবীন্দ্রনাথ বা ইয়েটস বা ভালেরির মতো পূর্বজদের এই প্রসঙ্গে বাদ দিতে হবে) চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে ধারণা করবার ও সত্যভাবে—কবিতার নিজস্ব সত্যার্থের কথা বলেছি আমি—প্রকাশ করবার সুযোগ ও অধিকার লাভ করেছে।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে এসব কৃতী আধুনিক কবিদের সামনে তেমন কোনো পরিচ্ছন্ন বিশ্বাসভূমি নেই—উপনিষদের ধর্মে ও বিজ্ঞানের

ফলাফলকে অধিগত করেও স্বাভাবিক আত্মিকতার (আধ্যাত্মিকতার) ক্রমপরিণতির ভূমিতে রবীন্দ্রনাথের নিকটে যা প্রায় কোনো সময়ই (রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে দ্বিধার পরিচয় দিয়েছেন যদিও) খুব দূরধিগম্য ছিল না। ক্রিশ্চান ঐতিহ্যের সক্রিয়তা—ও বলতে পারা যায় সজীবতা—ইউরোপে মধ্যযুগের কবিদের বিশেষ সম্বলের বিষয় ছিল, যেমন হিন্দু, মুসলিম, মরমী, বৈষ্ণব বা মানুষধর্মবাদ প্রভৃতির আশ্রয়ভূমি, আমাদের দেশের মধ্যযুগের কবিতার বিকাশ ও গতিপরিণতিকে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পেরেছিল; কিংবা রেনেসাঁসের মানবপ্রাধান্যবাদ বিশ্বাস ও সুগতি ও নির্মুক্তি, এলিজাবেথীয় ও সতেরো-আঠারো শতকের ইউরোপীয় সাহিত্যকে আশ্চর্যভাবে শৈথিল্যমুক্ত করেছিল।

আধুনিক কবিতা আজ পর্যন্ত ও রকম কোনো বিশ্বাসের প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেনি—কোনো ধর্ম বা দর্শনের চলিত মীমাংসাকে একান্তভাবে স্বীকার করে। কিয়ের্ক্‌গার্ড্ প্রভৃতি দার্শনিকের অস্তিত্ববাদ যা প্রমাণ করছে সেটা মানুষের প্রাণধর্মে টিকে থাকার—মনকে চোখঠার দিয়ে বা না দিয়ে—প্রাথমিক উপায় হিসেব (নিজের অজ্ঞাতসারে প্রায়ই) হাজার বছর ধরে গ্রহণ করে আসছে মানুষ। কিয়ের্ক্‌গার্ড্ প্রথম দার্শনিক তথ্য হিসেবে মানুষকে সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বুঝি; শেক্‌স্‌পীয়র-এর কথা ছেড়ে দিলেও গ্রীক নাটকের আদ্যোপান্ত ছেদ ও বিচ্ছেদের ধারণা ও প্রকাশের ভিতর, কিয়ের্ক্‌গার্ড্ ও তাঁর সাহিত্যিক শিষ্যদের রীতির চেয়ে আরো নিপুণ ও নির্ভুল প্রয়োগে, মানুষের জীবনের এই অন্তর্নিঃসহায়তার কথা ফুটে উঠেছে। কিন্তু তবুও শেক্‌স্‌পীয়র সব জেনেও নানাভাবে ভরসার পথ দেখিয়েছেন। আশা করা যাক আধুনিক বিজ্ঞানের (ফলিত বিজ্ঞানের কথা বলছি না আমি) ফলাফল কেবলই নিরাশাবাদকে প্রশ্রয় দেবে না; জাগতিক বিষয়ে ক্রমাগত যে আলোর অনুসন্ধান চলেছে সেটা সামাজিক ব্যাপারের অতীত অতিরিক্ত সম্পূর্ণ এক শূন্যসন্ধান নয়—সামাজিক স্তরে মানুষের খুব সম্ভব ভবিষ্যৎ রয়েছে—অনুভব করতে পারা যাবে হয়তো। বিজ্ঞানের, বা অন্য কোনো অনুভূতি বা সত্যের, সিদ্ধান্ত কবির নিকটে সৎ

মনে হলে যে বিশ্বাসে স্থিত হয়ে কবিতা লেখা সম্ভব তার অভাবেও, ভালো—এমন কি মহৎ, কবিতা রচিত হতে পারে—অবিশ্বাস বা অনিশ্চয়তার ভিতরে বিষয়ের মাহাত্ম্য রয়েছে বলে নয়—কিন্তু যে কোনো বিষয়—এমন কি অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসও—বিশেষ কবির হাতে শিল্পের সিদ্ধি লাভ করতে পারে বলে। কিন্তু এ রকম কবি ও তার এ ধরনের সম্ভাবনা ও সিদ্ধার্থ সাহিত্যের ইতিহাসে বেশি রয়েছে বলে টের পাইনি।

১৩৫৭

১

বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ

যত দূর সম্ভব সব বিষয়েরই মানে ও লক্ষ্য বুঝতে চেষ্টা করেছে অনেকদিন মানুষ। প্রায় পুরোপুরি চেতনায় মানুষ অনেক সময় কথা ভাবে—কাজ করে। যে সব মুহূর্তে চেতনার এ-দিককার অভিযান কম তখন আর এক রকম আলোর সন্ধান পাওয়া যায়, কেউ-কেউ বলে। মন-নির্মনের সন্ধি এই আলোর অপর রকম স্পষ্টতা দান করছে আমাদের—অনেক ধর্মসাধকদের এই মত। কোনো-কোনা কবিও এই আলোর স্থির স্পষ্টতার কাছে তাঁদের কবিতার ঋণ স্বীকার করেছেন। চেতনার লৌকিক স্বচ্ছতার চেয়ে এ আলোক, তাঁরা মনে করেছেন, কবিতা সৃষ্টির উপকরণগুলোকে উদ্বোধন করতেও সাহায্য করেছে বেশি; তারপর গ্রথিত করা—সঠিকভাবে—সেই উপকরণগুলোকে; তারপরে কবিতায় পরিণত করা। মানুষের সাংসারিক সজাগ মনের সম্পূর্ণ মধ্যস্থতায় এ কাজ সম্ভব নয়। দরকারী উপাদানগুলো কবিতা নয়, কবিতা হবে—সামাজিক তর্কবলে খানিকটা অবিশ্যি, কিন্তু যুক্তিতর্ক যেখানে সাময়িক ভাবে অন্তত অন্তিম প্রসাদ লাভ করেছে এমনই একটা স্পষ্ট, অটুট মন-নির্মনের সহায়তায়। এই হচ্ছে তাঁদের মত—যতটা বুঝতে পেরেছি আমি। এটা আমিও স্বীকার করি—সম্পূর্ণভাবে নয় অবিশ্যি—কিছু উনিশ-বিশ উপলব্ধি করে। যে সব কবি বিষয়কে কবিতাসত্তায় দাঁড় করানো সম্বন্ধে কোনো মতামত ব্যক্ত করেননি তাঁদের কবিতা পড়ে দেখলে বোঝা যাবে যে বিজ্ঞান দর্শন এমন কি ধর্মেরও পরিণত মীমাংসার চেয়ে আলাদা এক নির্মলতা রয়েছে কবিতায়; ভিন্ন ধরনের এক অব্যর্থ (বলা যাক একে) পদ্ধতির ফলে এই স্পষ্টতা সম্ভব হয়েছে।

এই স্পষ্টতা (ও দিব্যতা—আজকালও যেটাকে মনে হচ্ছে কবিতাপাঠকদের কাছে) কতদিন টিকবে কালের বিচারে? দর্শন ঠিক তার নিজের ভূমিতে টিকল না। যে রীতির প্রয়োগে দর্শনস্থিত বিষয়কে শিক্ষিত

বা অশিক্ষিতপটু মানুষের নিতান্তই ব্যক্তিগত ধারণার কোণ থেকে দেখবার ফলে, নানা রকম অসারতা ও অভাব বেরিয়ে পড়ছে তার; রীতিকে ক্রমেই বৈজ্ঞানিক করবার চেষ্টা করছে সে তাই; বিজ্ঞানের দার্শনিক ব্যাখ্যার স্তরেও হয়তো থাকবে না সে আর। দর্শন, আশঙ্কা করা যাচ্ছে, বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে থাকবে। দর্শন বলে কোনো জিনিস তার নিজের পরিচিত প্রস্থানে থাকতে পারবে আর? বিজ্ঞানের থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল ধর্ম; নিজের আগেকার 'স্বচ্ছ শিবত্বে' (সেটা বিজ্ঞানী সত্য হোক বা না হোক) যদি সে স্থির হয়ে থাকতে চায়—বিজ্ঞানের রীতি-পদ্ধতির থেকে দূরেই থাকতে হবে তাকে। কিন্তু এ রকম স্থিরতা ক্রমেই হারিয়ে ফেলছে ধর্ম ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখা যাচ্ছে। যুক্তিস্বচ্ছ নীতিকে এখনো ধর্ম বলা চলে না, কিন্তু বিজ্ঞানের একমাত্র সত্যে বিশ্বাস আরো বাড়তে থাকলে ঐ নীতি ছাড়া অন্য কোনো জিনিসকে ধর্ম বলে মনে করতে পারা যাবে না।

বিজ্ঞানের পদ্ধতি ছাড়া সত্য ও দিব্যতা লাভ করতে পারা যায় না এ রকম ধারণায় আজ পর্যন্ত কোনো বিশ্বাস নেই কবিতার; যত দূর বুঝতে পারছি ভবিষ্যতেও ও রকম একান্ত বিশ্বাসের কোনো তলব আসবে না বিজ্ঞানের কাছ থেকে বা প্রয়োজনীয়তা বোধ হবে না কবিতার দিক থেকে। বিজ্ঞানে যে সত্যের দেখা পাওয়া যায় কবিতায় তা অপর এক ভূমি লাভ করে সৃষ্টিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়নি বটে, কিন্তু পরস্পরের সাহায্যে আরও স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করছে। বিজ্ঞান যে সব সত্য লাভ করতে চাচ্ছে তা বিজ্ঞান নিজে সৃষ্টি করেনি, সেগুলো প্রায়ই সব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, আবিষ্কারে প্রায়ই ভুল বেরিয়ে পড়ে বিজ্ঞানীর, কখন সম্পূর্ণ শুদ্ধতা পাওয়া যাবে সেটাও স্থির হয় না। কবিতা মানুষের মনে স্থায়ী পদার্থের সৃষ্টি, স্থায়ী পদার্থকে চরিতার্থ করেও বটে এই সৃষ্টি। এর উপর কি করে হাত দেবে বিজ্ঞান? মানুষের নিবিড় ও মহৎ ও প্রায়ই কল্যাণকর তৃষ্ণা ও চরিতার্থতাকে নিঃস্বাক্ষরিত করে ফেলবার শক্তি আছে বিজ্ঞানের? তা নেই হয়তো, সে অভিরুচিও নেই; নিজে যে সব সত্য বের করে চলেছে সে তাও অনেক ক্ষেত্রেই সাময়িক—কবিতার সত্য মানুষের মনের স্বভাবপদার্থের

সঙ্গে সমসাময়িক। উপনিষদ শেক্‌স্‌পীয়র বা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যেটুকু তথ্য বিজ্ঞানের দান তা পর-পর কালের বিজ্ঞানই এসে অনেক সময় নাকচ করে ফেলেছে, কিন্তু নানা যুগের রুচির ইতরবিশেষ কত দূর আর খণ্ডন করছে শেক্‌স্‌পীয়রকে রবীন্দ্রনাথকে, জ্ঞানের দিক দিয়ে কিছু ব্যর্থ অব্যর্থ উপনিষদের বড় স্বভাবকবিতাকে?

এ রকম একটা বৃহৎ সময়ের ভিতর ফলিত হয়ে থাকবার সম্ভাবনা কবিতার। মানুষ যতদিন আছে ততদিন কবিতা প্রতিটি যুগের কিছুটা নতুন নমনীয়তায় নিজের নতুন সঙ্গতি লাভ করে অর্থ ও বিশেষত্বের নবতায় যুগকেও সঙ্গতি বোধ করতে সাহায্য করে—থেকে যাবে, আশা করা যাচ্ছে, মানুষের মন আশ্চর্য ভাবে বদলে যেতে পারে বটে—নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিংবা উন্নতির স্বর্গ লাভ করতে পারে, যদিও তার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমাদের কবিতা আজ পর্যন্ত, আমার মনে হয়, বাঙলাদেশের রাষ্ট্রকর্মের বৃত্তান্তে তেমন কিছু আবেগ ও মননভূমি না পেয়েও গভীরতর প্রসার পেয়েছে—বিশেষত শেষের দিকে—পৃথিবীরই আধুনিক কালের মহত্তর তাৎপর্যগুলোর সঙ্গে অনেকখানি যোগ রেখে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের থেকে বাঙলাদেশে স্বভাবতই ভালো কবি জন্মায় শুনে এসেছি। সত্য কিনা নির্ধারণ করা আমার পক্ষে কঠিন। প্রদেশ-ভাষাগুলো আমার প্রায়ই তেমন কিছু জানা নেই। স্পষ্ট অনুবাদ পাচ্ছি না। ও সব দেশের চেয়ে বেশি সংখ্যক কবি বাঙলাদেশে জন্মায় খুব সম্ভব। এ দেশে এক-আধটি কবি প্রায় প্রতি যুগেই থাকে—অথবা সমগ্র কবিতার একটা আবহ—যাকে বলা যেতে পারে বিশেষ কুশল। ধারণা করবার ও লিখবার কুশলতা কোনো না কোনো দিকে সিদ্ধিতে পৌঁছবে এ-রকম আভাস পাওয়া যায়— যেমন মধুসূদনের ভিতর, উনিশ শতকের কোনো-কোনো কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের আগের ও সমসাময়িকদের ভিতরে; আরো আগে অনেকখানি সীমা ও তুচ্ছতায় খণ্ডিত হয়ে তবুও—ঈশ্বর গুপ্তে। আরো কম স্থলে প্রকৃত সিদ্ধি দেখা যায়—যেমন বৈষ্ণব কবিতায় (একটা বিশেষ

দিকে)—রবীন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রনাথের পরে আধুনিক কালে কবিতার যে যুগ চলেছে তা স্তিমিত হয়ে পড়েছে—মাঝে মাঝে এ-রকম বোধ হতে থাকলেও এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো মীমাংসায় পৌঁছনো এখনই সম্ভব নয়। এ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে স্থির ভাবে সংকলিত করে টের পাওয়া যাবে প্রায় একটা প্রধান কাব্যের যুগের ভিতর দিয়ে চলেছি আমরা। সকলকে অতিক্রম করে একজন কি দুজন কবির নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠতা এ-যুগে ফুটে উঠেছে কিনা এখনো ঠিক ধরতে পারা যাচ্ছে না, পনেরো-কুড়ি বছর পরে আরো স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারা যাবে আশা আছে। সেই সময়, আমার মনে হয়, এ যুগের পরিসমাপ্তিও হবে। কাব্যের একটা বিশেষ যুগ বলে স্থির করা হবে—কবিতার আরো আয়ত্ত নিদর্শন সব ইতিমধ্যে রচিত না হলেও—আমাদের এই যুগকে। এ-সময়টায় খুব দীর্ঘ কবিতা রচিত হয়নি, কাব্যনাট্যও নেই, শ্লেষও মহান কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি। আসছে দশ-পনেরো বছরে আমাদের দেশে আধুনিক কবিতা এ-সব পরিণতির দিকে কোথাও-কোথাও মোড় ঘোরাবে কিনা ভাবছি। বাংলা কবিতা পরে—হয়তো অদূরেই—যা হবে, তার আলো এত দিনে কিছু-কিছু এসে পড়বার কথা আধুনিক কবিতাকে সপ্রতিভ ও সজাগ করে তোলবার জন্যে; এসেছে বলে মনে হচ্ছে না। একালের কবিতার কোনো-কোনো অভাব ও অস্পষ্টতার দিক এ-ভাবে টিকে থাকবে না; বাংলা কবিতার আধুনিক সময় যদি তা দান না করতে পারে ভবিষ্যত কালে (খুব দেরি না করেও) দীর্ঘ কবিতা ও শ্লেষে লিখিত মহা কবিতা আসতে পারে; এবং কবিতায় নাট্য। ইতিপূর্বে গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি দেশী ও গ্রীক (কারো হাতে) ও বেশি শেক্সপীয়রীয় (অপরদের হাতে—কিন্তু নতুন, জটিল সময়ের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রী ধারণ করে) বাঙলাদেশে, খুব শিগগির না হলেও, সৃষ্টি হবে একদিন; কেবলই খণ্ড কবিতার সিদ্ধি নিয়ে দূরতর ভবিষ্যৎ তৃপ্ত হয়ে থাকবে বলে মনে হয় না।

অসমাপ্ত আলোচনা

নানা কারণেই এখনকার বাংলা কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে আমি দ্বিধা বোধ করি। আমার এ-প্রবন্ধে আধুনিক বাঙালী কবিদের নাম উল্লেখ না করে এ-যুগের বাংলা কাব্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণায় উপস্থিত হতে চেষ্টা করেছি। আরো খানিকটা সময় কেটে না গেলে এ-ধরনের জিজ্ঞাসায় খুব বেশি সঙ্গতি থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

বাংলা কাব্যে বা কোনো দেশেরই বিশিষ্ট কাব্যে আধুনিকতা শুধু আজকের কবিতায় আছে—অন্যত্র নয়—একথা ঠিক নয়। আমাদের দেশের পুরোনো কবিদের একটা বড় কাব্যাংশে, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক ও সনেটে, ডানের ও রবীন্দ্রনাথের ঢের কবিতায় আধুনিকত্ব ক্ষুণ্ণ হবার কোনো কারণ ঘটবে বলে আজকের দৃষ্টি নিয়ে অন্তত আমি বুঝতে পারছি না।

এখনকার বাংলা কাব্যে যে কালের জিজ্ঞাসামুক্ত কবিতা নেই তা নয়, কিন্তু মোটামুটি এ-সব কবিতা একালে লেখা হয়েছে বলেই এগুলোকে আধুনিক বলা হয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় পনেরো বছর আগেই একটা নতুন প্রস্তুতির ইশারা পাওয়া যাচ্ছিল বাংলা কাব্যে; সেটা 'কল্লোলে'র সময়। 'কল্লোলে'র লেখকেরা মনে করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ অনেক সার্থক কবিতা লিখেছেন—কিন্তু তিনি যাবতীয় উল্লেখ্য বিষয় নিয়ে কবিতা লেখবার প্রয়োজন বোধ করেন না—যদিও তাঁর কোনো-কোনো কবিতায় ইতিহাসের বিরাট জটিলতা প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়; তিনি ভারত ও ইউরোপের অনেক জ্ঞাত ও অনেকের মতে শাশ্বত বিষয় নিয়ে শিল্পে সিদ্ধি লাভ করেছেন, কিন্তু জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের নানারকম সঙ্কেত রয়েছে যা তিনি ধারণা করতে পারেননি বা করতে চাননি। ঠিক এই ভাষায় যে এই ধরনের যুক্তি তাঁরা অনুসরণ করেছিলেন তা নয়, যুক্তিগুলোও সত্য-মিথ্যায় মেশানো; কিন্তু এই ভাবেই দানা বাঁধছিল। নতুন উপায়ে নতুন

বিষয়ের অবতারণা করে কবিতা লেখবার প্রয়োজন বোধ করলেও, রবীন্দ্রনাথ যা দিচ্ছিলেন কল্লোলীয় কাব্যে তার অনুলেখনই বেশি চলছিল। যে দিক দিয়ে সে-সব কবিরা নতুন ভূমিকা সামান্য পরিমাণে নিতে পেরেছিলেন সেটা মানুষের জীবনের একটা বিচিত্র দিককে নিয়ে অস্পষ্ট এবং খুব সম্ভব অসাহিত্যিক নিমজ্জনের ভিতর। প্রায় অনুরূপ জিনিসকেই লরেন্স যেভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর উপন্যাসে বা ইয়েট্‌স যে পরম রঙ্গে ও প্রজ্ঞায় তাঁর শেষের দিককার কবিতায়, তার থেকে এসব রচনা নিচু স্তরের। কবিতার ছন্দ ও আঙ্গিকেও কোনো নতুন আবিষ্কার হয়েছিল মনে হয় না। তবে গদ্যকবিতার একটা বিশেষ ভঙ্গি—যা ঠিক রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায় না—তার ভিতর 'কল্লোল' নিজের মন খুঁজে পেয়েছিল বোধ হয়।

কিন্তু প্রায়ই ব্যর্থ হলেও এবং মোটামুটি রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে কবিতা লিখে গেলেও নতুন ভাষায় তাৎপর্য আনবার যে একটা উদ্যোগ চলছিল 'কল্লোলে'র সময়, তার মূল্য স্বীকার করতে হবে, এবং কয়েকটি কবিতা অন্ততঃ সার্থক হয়েছিল; সে সম্বন্ধে অন্যত্র স্বতন্ত্র আলোচনার বিশেষ দরকার। ফলে প্রতীকী সুররিয়ালিস্ট ও অন্য নানা জাতীয় লেখা ও মুখ্যত প্রচার, সমাজশিক্ষা বা লোকশিক্ষাসর্বস্ব রচনা ক্রমে-ক্রমে দেখা দিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতায় যে ব্যাপকতা এনেছে তার কতটা কাব্য ও তা কি পরিমাণে গভীর—এ প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার বিচারের চেয়ে সমালোচকদের রুচি ও সংস্কারের সঙ্গে বেশি জড়িত হয়ে রয়েছে এখনো।

কোনো-কোনো সমালোচকের ধারণা যে একালের কাব্যেও রবীন্দ্রনাথের অবসান হয়নি বরং বিশেষ করে তাঁরই অনুভাবে একটা উল্লেখ্য আধুনিক কাব্যযুগ দাঁড়াতে পেরেছে। এ-রকম মন্তব্যে অনেকখানি অর্ধসত্য রয়েছে। অবশ্য আধুনিক কালে দু-একজন বিশিষ্ট কবির প্রধান কবিতাগুলোও বার-বার রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়িয়ে দেয়। আরো দু-একজন ভালো কবি তাঁরই জিনিস নিয়ে সাধক হয়েছেন বলে মনে হয়; কিন্তু জিনিস যারই হোক তাকে উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে যদি রচনায়

পৃথক সিদ্ধি পাওয়া যায় তাহলে শিল্পীর উপায় নিয়ে প্রশ্ন করার কোনো মূল্য নেই। অন্য দিকে দু-একজন কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে অবহিত থেকেও নতুন বীক্ষা ও রীতি-নীতির ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণ বিশদভাবে কিছু বলা দরকার। কিন্তু সে সুযোগ ও সময় সম্প্রতি আমার নেই।

কোনো-কোনো কবির হাতে ক্লাসিক বা মাত্রানিষ্ঠ রীতির এমন একটা প্রতিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যা রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর সমসাময়িকদের ভিতর প্রায়ই ছিল না। ছন্দ ও ভাব-স্বাধীনতার রীতিই রবীন্দ্রনাথের। এই রীতিতে কবিতা লেখা আধুনিকদের স্বাতন্ত্র্যের দিক দিয়ে ত্যাজ্য মনে হলেও তাঁদের কারো কারো হাতে এ ধরনের কবিতা আলাদা সাফল্য লাভ করেছে। কোনো-কোনো আধুনিক কবিতা অন্তর্জ্ঞানের দুয়ার যথাসম্ভব খোলা রেখেছে; আগেকার যুগের কবিরাও স্বভাবতই অবচেতনার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়ে এসেছেন, কিন্তু সে পদ্ধতি সম্বন্ধে পরিষ্কার বোধ না থাকায় সেটাকে বড় একটা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করেননি; কিন্তু আজকাল এ-উপায়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভব করা গেছে। মালার্মে বা র‍্যাঁবো বা রিলকের মতন প্রতীকী কবিতা রচনা করবার তাগিদ তিন-চার দশক আগে বাংলা কবিতায় ছিল না; কিন্তু আজকের বাঙালী প্রতীকী কবির গুরু মালার্মেই হন বা কবির নিজের বিচিত্র চিত্ত—এ কবিতা এ-যুগের বাংলা কাব্যে এসে পড়েছে।

নিজের দেশের কবিতার দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের ভিতর স্থিত হয়েও আজকের মুখ্য কবি পৃথিবীর, বিশেষত পশ্চিমের, শ্রেষ্ঠ কাব্য উপলব্ধি করতে পেরে বাংলা কবিতাকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করাতে পেরেছেন যে তার ভবিষ্যৎ পরিণতির প্রশ্ন বৈষ্ণব পদাবলী মঙ্গলকাব্য পূর্ববঙ্গের গীতিকা বা মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের সত্যের ভিতরেই শুধু আটকে নেই—কিন্তু যেখানেই মানুষ তার স্বতন্ত্র আধুনিক চেতনাকে মহান কবিতায় প্রকাশ করতে পেরেছে সে-সবের সঙ্গেও যুক্ত। এ জিনিস মধুসূদন বুঝেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ আরো গভীরভাবে; আধুনিক কালের আরো জটিল বিন্যাস কবির কাছ থেকে এ-বিষয়ে অপার সতর্কতা ও তেমনই

অধ্যবসায় ও মননের ক্ষমতা দাবি করছে। সে দাবী মেটাবার শক্তি কবিদের যত বেশি—বর্তমানের কবিতা অর্থশীল হয়ে ওঠবার তত বেশি সুযোগ পেতে পারে। আগাগোড়া বাংলা কাব্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধই সব চেয়ে আগে এবং সর্বদাই দরকারি। কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দরকার ও-দেশের বিশেষত ইংরেজি ও ফরাসি কবিতার মর্ম হাড়ের ভিতর বোধ করবার শক্তি। সেটা যত বেশি সম্ভব হবে বর্তমান বাংলা কাব্য রচনার হেতু ও সার্থকতা তত বেশি স্পষ্ট হতে থাকবে বলে মনে হয়। অবিশ্যি ত্রিশ-চল্লিশ বছর পরে এ-মন্তব্যের সত্যতা কতদূর টিকে থাকবে আমি বলতে পারছি না। মারাঠি, গুজরাটি, তামিল বা হিন্দী কাব্য যদি এ-বিষয়ে ফরাসি বা ইংরেজির স্থান নিতে পারত তাহলে জাতীয় সংস্কৃতির দিক দিয়ে জিনিসটা হয়তো ঠিক হত;(যদিও আমি জাতীয় সংস্কৃতির ও-ধরনের হিসেবে বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য মনে করি;) কিন্তু সে-রকম কোনো সম্ভাবনা শিগগির আছে বলে মনে হয় না।

পুরোনো পদ্ধতিতে কবিতা লিখলেই সেটা নিরর্থক হয় না। কিন্তু দেশ ও সময়ের বিশেষত্ব ও মানুষের রুচি-বিচার এত বদলাচ্ছে যে বাল্মীকি হোমর ইত্যাদি আদি কবিদের নিয়ে কাব্যের একটা কাল কেটে গেল বলে আমার মনে হয়—যা প্রায় একই জাতীয় সময় দেশ ও চৈতন্যের শিল্পফল; আমাদের দেশের মধ্যযুগের কবিতা অন্য এক পরিবর্তিত নমুনার এবং ও-দেশের দান্তে ও তারপরে শেক্‌স্‌পীয়র অন্য সব পরিবর্তিত নমুনার; ফ্রান্সের প্রতীকী কবিতা আরো বিচিত্র শিল্পফল। অবশ্য সমস্ত নমুনার সুন্দর মহৎ শোকাবহ চেহারার ভিতর দিয়ে অনেক মানুষ যা সনাতন বলে মনে করে সেই সব মূল্যের প্রকাশ অনেক সময়ই স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু নতুন সময়ের জন্যে নতুন, ও নতুন ভাবে নির্ণীত পুরোনো মূল্য, নতুন চেতনা ও ভাবে আবিষ্কৃত পুরোনো চেতনার যে একান্ত দরকার শিল্পে ও জীবনে, এ কালের কোনো-কোনো বাঙালী কবি সেটা বুঝতে পেরেছেন বলেই আজকের বাংলা কবিতা স্বভাবতই বিষয় ও রীতি নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষার একটা অব্যাহত প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত পরীক্ষার ভিতর

দিয়ে সে সিদ্ধি পাওয়া গেল তা খুব বেশি না হলেও, আমার মনে হয়, নিতান্ত কম নয়।

এ-কাব্যযুগ এখনো চলছে, যাঁদের হাতে সমাপ্তির ভার খুব সম্ভব তাঁদের কারো লেখাই এখনো শেষ হয়নি। দশ-বারো বা পনেরো বছর পরে এ-কালের বাংলা কবিতার আরো সঙ্গত পরিচয় পাওয়া যাবে আশা করা যায়। যে অর্থে আধুনিকতা আপেক্ষিক সে হিসেবে এ-কবিতা আধুনিক বলে গণ্য হবে না তখন; কিন্তু অন্য অর্থে এ-কাব্যের কোনো-কোনো দিক অন্তত তাড়াতাড়ি লুপ্ত হবে না; আরো কতকগুলো দিকে বেশি স্থায়ী দান রয়েছে। দানের শ্রেষ্ঠতার অবশ্য তারতম্য আছে। পাঠক ও সমালোচকদের ভিন্ন রুচি ও বিচার অনুসারে সেটা বিভিন্নভাবে নির্ধারিত হতে থাকবে অনেকদিন পর্যন্ত। প্রায় সমস্ত শিক্ষিত রুচি ও বিচারকে সমষ্টি-চরিতার্থতায় মেলাবার ক্ষমতা একান্ত মহাকাব্যই লাভ করতে পারে—সময়ের ভিতর দিয়ে অনেক চলাফেরার পর। আধুনিক বাংলা কাব্য সে সময় সংস্থান এখনো পায়নি; যখন পাবে তখন এ-কালের ভালো কবিতাগুলোর শ্রেষ্ঠতার তারতম্য আরো পরিষ্কারভাবে চোখে পড়বে; কিছু মহৎ কবিতা আছে কি নেই সে সম্বন্ধে ধারণা আরো বেশি নির্ভুল হবে।

১৩৬০

'সকলেই কবি নয়। কেউ-কেউ কবি।

এবং তাঁদের মধ্যে জীবনানন্দের আসন প্রথম সারিতে।

কবিতা ছাড়া, কবিতা বিষয়েই কতিপয় মূল্যবান

প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন যাতে পাঠকের পক্ষে

'খারাপ কবিতার থেকে ভালো কবিতা, এবং

সব কবিতার থেকেই মহৎ কবিতা চিনে নেবার আগ্রহ'

ক্রমেই শিক্ষিত হতে পারে। এই সব প্রবন্ধের মধ্যে

কাব্য বিষয়ে তাঁর জ্ঞান, বোধ, অভিনিবেশ

এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়, তাঁর কাব্যের মতোই

একান্ত নিজস্ব এক ভাষায় বিধৃত হয়ে আছে

গ্রন্থাকারে এই সব আলোচনার

প্রতি কাব্যের—বিশেষত আধুনিক কাব্যের—

পাঠকমাত্রই ঋণী বোধ করবেন।